মাসুদ রানা

অন্ধ শিকারী

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অন্ধ শিকারী ১

কাজী আনোয়ার হোসেন

বহু বছর পর লণ্ডনের রাস্তায় নিজের এক শিস্যের সঙ্গে হঠাৎ করেই দেখা হলো গিলটি মিয়ার। এর পরপরই শুরু হলো ঘটনা প্রবাহ।

জড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা।
ক্রমে উন্মোচিত হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের এক ঘৃণ্য, বিশ্বাসঘাতী ষড়যন্ত্র।
যা সফল হলে পারমাণবিক শক্তিগুলো জড়িয়ে পড়বে স্যাবোটাজ কাউন্টার-স্যাবোটাজে—বীভৎস প্রতিশোধের লড়াইয়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২১৭

অন্ধ শিকারী ১

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা-২১৭

অন্ধ শিকারী ১

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7217 - 0

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও.বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-217
ANDHO SHIKARI
Part-1
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

এক

মস্কো। প্রসপেক্ট মিরা ওয়ান ইলেভেন। সুউচ্চ এক ফ্রন্ট অ্যাপার্টমেন্টের চারতলা। বিলাসবহুল সীটিংরুমে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়সী, রাশভারি এক ব্যক্তি—জেনারেল পিওতর সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো। গ্লাভনোই রাযভেদিভেটেলনোই আপ্রাভলেনিয়ে বা জিআরইউ বা সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স প্রধান। বেলা বাজে এগারোটা। এখনও রোব পরে অলস পায়ে ঘরময় পায়চারি করছেন জেনারেল।

আজ অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই তাঁর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বময় কর্তা, প্রেসিডেন্ট ও পার্টির সাধারণ সম্পাদকের গোপন নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি নিয়েছেন। অসুস্থতার অজুহাতে। আজই শুরু হয়েছে ছুটি। কেন হঠাৎ করে ছুটি নিতে বলা হয়েছে জানেন না জেনারেল মার্চেঙ্কো, তবে অনুমান করতে পারেন।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে সপরিবারে নিজের সরকারী সামার রিট্রিট কিসলভদ্‌সক্‌-এ গিয়েছিলেন মার্চেঙ্কো। ওখানে অবসর কাটানোর ফাঁকে ফাঁকে ব্রিটেনের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভদের পরাজিত করে লেবার পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে বিস্তারিত এক রিপোর্ট তৈরি করেন তিনি। লেবার পার্টি মস্কোপন্থী, ওদের ক্ষমতায় বসানো গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাভ। ছুটি সেরে মস্কো ফিরে

রিপোর্টটা সাধারণ সম্পাদককে নিজে যেচে পড়তে দিয়েছিলেন জেনারেল মার্চেঙ্কো।

তিনি জানেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করেন, তাঁর দেখিয়ে দেয়া পথে এগোতে পারলে লেবার পার্টির জয় ঠেকাতে পারবে না কেউ। ওরা ক্ষমতায় গেলে দলের ভেতর যেসব কট্টর মার্কস-লেনিন ও ট্রটস্কিপন্থী আছে, তাদের সাহায্যে চরম এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়া যাবে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে। তাঁর এ বিশ্বাসের কারণ আছে। গত দু'বছর ধরে টাকা, মেয়েমানুষ এবং আনুষঙ্গিক এটা-ওটার দেদার চাহিদা মিটিয়ে আসছেন জেনারেল ওই দলের বাঘা বাঘা সব 'পন্থীদের'।

অর্থের অভাব নেই জেনারেল মার্চেঙ্কোর। রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে দেশের স্বার্থে যত খুশি খরচ করার অধিকার রয়েছে তাঁর। তেমনি লোকবল। শুধু ব্রিটেনেই আছে ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে কয়েক হাজার জিআরইউ রেসিডেন্ট। প্রায় সবাইকেই কাজে লাগিয়েছেন তিনি। আর মেয়েমানুষ? ওর চেয়ে সস্তা আর কি আছে দুনিয়ায়? এর ফলও তেমনি পেয়েছেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। সম্প্রতি ব্রিটিশ ডিফেন্স মিনিস্ট্রির এক রাঘব বোয়ালের কাছ থেকে এক হাত ঘুরে ন্যাটোর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট হাতে পড়েছে তাঁর, যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। কাজেই ছুটি নেয়ার গোপন নির্দেশের কারণ যে তাঁর সেই রিপোর্ট, অনুমান করতে পারেন জেনারেল পিওতর সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো।

ডিসপেনসার থেকে গরম এক কাপ কালো কফি নিয়ে আবার সীটিংরুমে ফিরে এলেন তিনি। বাসায় এ মুহূর্তে আর কেউ নেই। স্ত্রী দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে বরফ জমা গোর্কি পার্কে স্কেট্ করতে গেছেন। আকাশের মুখ ভার। আধ ঘণ্টাখানেক হলো বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে। তবে ভাব দেখে বোঝা যায় আবার শুরু হলো বলে। অ্যাপার্টমেন্টের সামনের

প্রশস্ত রাস্তায় জমে ওঠা বরফ নিরলসভাবে পরিষ্কার করে চলেছে গোটা ছয়েক বাবুশকা।

আনমনে ওদের কাজ দেখছেন সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো। থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছেন গরম কফিতে। হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। কে এল? স্ত্রী বা ছেলেমেয়েরা হতে পারে না, ঘণ্টাখানেকও হয়নি বেরিয়েছে তারা।

প্রসপেক্ট মিরা ওয়ান ইলেভেন মূলত জিআরইউর সিনিয়র অফিসারদের আবাসিক এলাকা। এদের পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরের আর কেউ প্রবেশ করতে চাইলে হোস্টের অনুমতি প্রয়োজন হয়। এছাড়া গার্ড পোস্টের ঝামেলা তো রয়েইছে। কাজেই বাইরের কেউ হতে পারে না। তাহলে কে? ভাবতে ভাবতে দরজা খুললেন জেনারেল।

দীর্ঘদেহী এক যুবক দাঁড়িয়ে সামনে। অচেনা। এ নিশ্চয়ই অন্য কারও কাছে এসেছে, ভাবলেন তিনি। পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না বয়স। পরনে চমৎকার ছাঁটের গ্রে ওভারকোট, মাথায় ফারের শাপকা। শীতল, স্থির চাউনি তার নীল দু-চোখে। তার খটখটে শুকনো পালিশ করা জুতো ইঙ্গিত দিচ্ছে, উষ্ণ গাড়ি থেকে সরাসরি সেন্ট্রালি এয়ারকণ্ডিশণ্ড এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে প্রবেশ করেছে সে।

ওপরে উঠে এল জেনারেলের দৃষ্টি। চোখাচোখি হলো দুজনের। এই সময় কথা বলে উঠল যুবক। ভরাট, প্রায় গমগমে কণ্ঠে বলল, 'কমরেড জেনারেল পিওতর মার্চেঙ্কো?'

'হ্যাঁ!' বিস্মিত হলেন তিনি। এ তাঁরই কাছে এসেছে! আশ্চর্য! কই, গেটের সিকিউরিটি তো হোস্টের অনুমতি চায়নি! এ জাতীয় ব্যতিক্রম আর কখনও এই ব্লকে হয়েছে বলে জানা নেই জেনারেলের।

'আমি মেজর কিরলভ। নাইনথ্ ডিরেক্টরেট। সিপিএসইউ জেনারেল সেক্রেটারির পার্সোন্যাল স্টাফ।'

কেজিবির অসংখ্য শাখার একটি নাইনথ্ ডিরেক্টরেট। উঁচু পদের পার্টি নেতাদের ব্যক্তিগত এবং অফিস ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান এদের কাজ। এদের মত সব বিষয়ে কড়া ট্রেইনড্, বিশ্বস্ত এবং নির্দয় বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে আর একটিও গড়ে ওঠেনি। ক্রেমলিন গার্ড এদের আরেক পরিচয়। জেনারেলের কোঁচকানো ভুরু সমান হয়ে গেল। নামটা কানে যাওয়ামাত্র বুঝতে পেরেছেন, এই মেজরই পরশু জেনারেল সেক্রেটারির তরফ থেকে ফোনে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল।

'বলুন, মেজর?'

'একটা চিঠি, কমরেড জেনারেল,' গ্রেটকোটের পকেট থেকে বাদামি রঙের একটা খাম বের করে এগিয়ে ধরল মেজর কিরলভ।

'ধন্যবাদ।' খামটা রোবের পকেটে রাখতে যাচ্ছিলেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। থেমে গেলেন মেজরকে মাথা দোলাতে দেখে।

'দুঃখিত, জেনারেল। ওটা পড়ে এখনই ফেরত দিতে হবে।'

কৌতুক বোধ করলেন মার্চেঙ্কো। 'কার নির্দেশে?'

'জেনারেল সেক্রেটারি, সিপিএসইউ,' বলতে গিয়ে একটু যেন কঠোর হয়ে উঠল মেজরের চেহারা।

মুহূর্তে কৌতুক উবে গেল জিআরইউ প্রধানের। 'আই সী! তা...ইয়ে, ভেতরে আসুন, মেজর।'

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল। আমি এখানেই অপেক্ষা করতে চাই।'

'বেশ।' কয়েক পা পিছিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভেতরের চিঠিটা বের করে পড়লেন। পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল। মোটা নিবের সাহায্যে স্বয়ং জেনারেল সেক্রেটারি লিখেছেন চিঠিটা। ছাপার মত ঝরঝরে হস্তাক্ষর, চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে

করে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি, বাড়তি কথা নেই একটিও।

যা অনুমান করেছিলেন জেনারেল, ঠিক তাই। আচমকা তাঁকে ছুটি নেয়ার নির্দেশের পটভূমি তাঁর সেই রিপোর্টটিই। এবং আজই, ৩১ ডিসেম্বর, এ ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন সাধারণ সম্পাদক। মাঝরাতে। পড়া শেষে চিঠিটা মেজর কিরলভের হাতে ফেরত দেয়ার নির্দেশও আছে ওতে। খামে পুরলেন জেনারেল চিঠিটা। ফিরে এলেন দরজার কাছে।

ওটা পকেটে রেখে বলল মেজর, 'ঠিক সাড়ে এগারোটায় আপনার জন্যে গাড়ি নিয়ে নিচে অপেক্ষা করব আমি, কমরেড জেনারেল।'

'আমি অধীর অপেক্ষায় থাকব,' হাসি ফুটল মার্চেঙ্কোর মুখে।

মেজরের গাম্ভীর্যেও যেন সামান্য ফাটল ধরল এবার। তবে তা খুবই সামান্য। জেনারেলকে সম্মান জানানোর জন্যে নড করল কিরলভ। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লিফটের দিকে চলল। এক মিনিট পর সীটিংরুমের জানালা দিয়ে কুচকুচে কালো একটা চইকা লিমুজিন বেরিয়ে যেতে দেখলেন জেনারেল। সেন্ট্রাল কমিটির এমওসি নাম্বার প্লেট ওটার। শোফার নেই, মেজর নিজেই ড্রাইভ করছে। বড় রাস্তায় উঠে দক্ষিণমুখো ছুটল চইকা।

ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল। হাসতে শুরু করলেন। ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে চেহারা। তাঁর রিপোর্টটা মনে ধরেছে জেনারেল সেক্রেটারির, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আরও সুখের এবং তৃপ্তির ব্যাপার যে ওটা প্রস্তুতের আর কোন ভাগীদার নেই। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর একার। সব যদি ঠিকঠাক মত চলে, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরপর একদিন পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য দেশগুলোর, এক এক করে। হুঁম! মাঝরাতে, ভাবলেন মার্চেঙ্কো।

মস্কোর হাজার মাইল পশ্চিমে, লণ্ডনে, আরও একজন ভাবছে মাঝরাতের

কথা। অভিজাত ওয়েস্ট এণ্ডের বেলগ্রাভিয়া রোডের এক কার পার্কে ভাড়া করা পিচ্চি এক ভলভো এস্টেটে বসে আছে সে। নজর উল্টোদিকের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ফন্টেনয় হাউসের ওপর।

পাকা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে জিম প্রেসটনের, আজ রাতেই মহামূল্য গ্রেন ডায়মণ্ডগুলো হাতাবে সে। ঠিক মাঝরাতে। সারা শহর যখন নতুন বছরকে বরণ করার উৎসবে বেসামাল উন্মত্ত থাকবে, তখন। তবে আগে নিশ্চিত হতে হবে ওগুলো সে সময় জায়গামতই থাকবে, স্থান বদল করবে না। এবং ওগুলোর মালিক, শেফিল্ডের ডিউকের ছোটবোন, লেডি ফেডোরা; যেমনটি খবর সংগ্রহ করা গেছে, ডিউকের আমন্ত্রণে তাঁর উত্তর ইয়র্কশায়ারের বাগানবাড়িতে আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্বামীসহ লণ্ডন ত্যাগ করছেন।

জিম প্রেসটন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। জন্ম কলকাতায়। বছর পনেরো আগে এ দেশে আগমন তার। আর ফিরে যায়নি। রয়ে গেছে দূর সম্পর্কীয় এক চাচার আশ্রয়ে। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ প্রেসটন। নারকেলের রশির মত পাক দেয়া পেশীবহুল চওড়া দেহ। চেহারা শিশুসুলভ। একমাথা কোঁকড়া কটা চুল, আগোছাল। পেশায় আগে ছিল প্রেসটন ছিঁচকে চোর। হাতে খড়ি নিয়েছিল কোলকাতায় বাঙালি এক ওস্তাদের কাছে। বর্তমানে চুরি ছেড়ে খানিকটা জাতে উঠেছে সে। লণ্ডনের অন্যতম সেরা ক্র্যাকস্‌ম্যান এখন জিম প্রেসটন।

পিঠ সোজা করে বসে আছে সে। পরনে শোফারের ইউনিফর্ম। এটাও ভাড়া করা। ফন্টেনয় হাউসে থাকে তার শিকার। স্থির, নিষ্কম্প দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে আছে প্রেসটন। পার্কে আরও অনেক গাড়ি আছে, প্রায় সবগুলোর সঙ্গেই রয়েছে ইউনিফর্ম পরা শোফার। কাজেই প্রেসটন নিশ্চিত, কেউ সন্দেহ করবে না তাকে। ঠিক সাড়ে সাতটায় মৃদু হাসি

ফুটল তার মুখে। বেরিয়ে আসছে শিকার। লেডি ফেডোরা এবং তাঁর স্বামী, রবার্ট ফিলবি।

ভবনের আউট লেখা গেটের বিশাল স্টীলের পাল্লা খুলে গেছে। ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক লিমুজিন—ডিমলার জাগুয়ার। রবার্ট ফিলবি নিজেই ড্রাইভ করছেন। ভদ্রলোক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন হোমরা চোমরা। পাশেই লেডি ফেডোরা। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো প্রেসটন। সকালের মিষ্টি রোদ জাগুয়ারের মসৃণ চকচকে দেহে পড়ে পিছলে এসে ধাঁধিয়ে দিয়েছে চোখ।

এক মুহূর্ত থেমে থাকল গাড়িটা। বড় রাস্তায় ওঠার আগে ডানে-বাঁয়ে দেখে নিলেন ফিলবি। তারপর নিঃশব্দে গড়িয়ে দিলেন ভারি জাগুয়ারটিকে। মসৃণ গতিতে জিম প্রেসটনের নাকের ডগায় এসে বাঁক নিল ওটা, তারপর রাজকীয় চালে ছুটল হাইড পার্ক কর্নারের দিকে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর স্টার্ট দিল প্রেসটন, লট থেকে বেরিয়ে এসে রওনা হলো পিছন পিছন।

দশ মিনিট পর পার্ক লেনে পড়ল গাড়ি দুটো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল প্রেসটন। সামনে কাউটস্ ব্যাঙ্কের একটি শাখা রয়েছে। লকার ভাড়া দেয়াই এদের মূল ব্যবসা। ভয় হলো ডায়মণ্ডগুলো হয়তো ওদের কাছে গচ্ছিত রেখে যাবেন লেডি ফেডোরা। কিন্তু না, থামল না জাগুয়ার ব্যাঙ্কের সামনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল প্রেসটন।

গতি ক্রমেই বাড়ছে সামনের গাড়ির। গ্রেট কাম্বারল্যাণ্ড প্লেস ছাড়িয়ে গ্লস্টার প্লেসে পড়ল ওটা। ঝড়ের গতিতে ছুটছে এখন উত্তরমুখো, ইয়র্কশায়ারের দিকে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এম ওয়ান মোটরওয়েতে ওঠা পর্যন্ত জাগুয়ারের পিছনে লেগে থাকল জিম। তারপর খুশি মনে ফিরে চলল শহরের দিকে। ইয়র্কশায়ার পৌঁছতে পুরো ছয় ঘণ্টা লাগবে ডিমলার জাগুয়ারের।

তাহলে? ভাবছে জিম প্রেসটন, ডায়মণ্ডগুলো স্থান বদল করেনি।

ফন্টেনয় হাউসেই আছে। না থাকার কোন কারণ নেই। ব্যাঙ্কে রেখে যাননি ওগুলো লেডি ফেডোরা। গত এক সপ্তাহ তার চ্যালা বিল সাইমন কড়া নজর রেখেছে ফিলবি দম্পতির ওপর। এর মধ্যে কোন ব্যাঙ্কেই যাননি ওঁরা। সঙ্গে করেও নিয়ে যাননি। এক মিলিয়ন পাউণ্ডে ইনশিওর করা আছে ডায়মণ্ডগুলো, লণ্ডন থেকে অতদূরে নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ওগুলো নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না ইনশিওরেন্স কোম্পানি।

অতএব? নিশ্চিন্ত মনে চড়াও হবে সে আজ ফন্টেনয় হাউসে। কাজ সারতে এক ঘণ্টা, বড়জোর দেড় ঘণ্টা লাগবে তার। বাজারে চালু যে-কোন তালা বা সেফ খোলা বিশেষ কোন ব্যাপার নয় জিম প্রেসটনের কাছে। মাত্র কয়েক মিনিটের খেল্। আসল হলো কৌশল, ওটা জানা চাই প্রথমে। তারপর তার প্রয়োগ। এ সব শিখেছে প্রেসটন চাচার কাছে। দু বছর হলো মারা গেছে চাচা। তার আগে দূর সম্পর্কের ভাতিজাকে নিজের জানা সমস্ত কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেছে লোকটা।

প্রেসটনের মত সে-ও ছিল নামকরা ক্র্যাকস্‌ম্যান। দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভাতিজাকে মনের মত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল সে মৃত্যুর আগে। এ লাইনে কাজ করে প্রচুর কামিয়েছে প্রেসটন। টাকার কোন অভাব নেই তার। তবে অন্যের হয়ে এ কাজ করে না সে কখনও, করে কেবল নিজের জন্যে। আত্মতুষ্টির জন্যে। বয়স ত্রিশ পার হতে চলল, এখনও বিয়ে থা' করেনি জিম প্রেসটন। দক্ষিণ লণ্ডনের ওয়াণ্ডওঅর্থে চার রুমের বিশাল এক ফ্ল্যাট ভাড়া করে রাজার হালে থাকে। একজনের তুলনায় ফ্ল্যাটটা অতিরিক্ত বড়, ভাড়াও তেমনি। কিন্তু তাতে পরোয়া নেই প্রেসটনের। দু-হাতে খরচ করে।

তবে বাইরে প্রেসটন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। চোখে পড়ার মত দামী কাপড় চোপড় পরে না। চলাফেরা করে ঝক্কর মার্কা একটা ফিয়াটে । ওটা

ছিল চাচার। মারা যাওয়ার সময় দিয়ে গেছে ওকে। সামর্থ্য থাকলেও নতুন গাড়ি কেনেনি, পরিচিতদের চোখ টাটাতে পারে, তাই।

আরাম আয়েশের সব রকম আধুনিক উপকরণ আছে তার ফ্ল্যাটে। একটা বড় বদ-অভ্যেস প্রেসটনের, কিছু একটা চোখে পড়লে বা মনে ধরলেই হলো। সেটা তার চাই-ই চাই। তার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত সে। গত কয়েক মাস আগে থেকে লেডি ফেডোরার গ্রেন ডায়মণ্ডগুলোর ওপর চোখ পড়েছে তার। সেই থেকে লেগেছে ওর পিছনে।

লণ্ডন আণ্ডারওয়ার্ল্ডে প্রচুর প্রভাব প্রেসটনের। যদিও সেখানকার কেউ নিশ্চিত জানে না কি কাজ করে সে। পুলিসের কাছে 'ফেস' বা 'প্রোফাইল' হিসেবে পরিচিত সে। তবে ওদের 'ফর্ম বুকে' কোন অভিযোগ নেই প্রেসটনের বিরুদ্ধে। লোক দেখানো একটা ব্যবসা আছে তার। কার রেকিঙের ব্যবসা। সেই সুবাদে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সজ্জিত এক মেশিন ওয়ার্কশপের মালিক সে। এর জন্যে আছে দুই কর্মচারী। যারা আসলে দক্ষিণ লণ্ডনের দাগী মাস্তান। ঝুট্ ঝামেলায় পড়তে হয় প্রেসটনকে প্রায়ই, তখন ওদের প্রয়োজন পড়ে।

রেন্টাল কোম্পানিতে প্রথমে গাড়িটা ফেরত দিল জিম প্রেসটন। তারপর শোফারের ইউনিফর্ম। ওর নিচে একটা গরম পোলো গেঞ্জি এবং ট্রাউজার পরাই ছিল তার। টুকটাক কিছু কেনাকাটা সেরে ট্যাক্সি চেপে রওনা হলো সে দক্ষিণ লণ্ডনের দিকে। মাইল তিনেক এগিয়ে হঠাৎ ফুটপাথে অতিপরিচিত একজনকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল প্রেসটন বসা অবস্থায়। 'ড্রাইভার! পুল ওভার! পুল ওভার!!'

ডানদিকের ফুটপাথ ধরে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলেছে মানুষটি। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ পিছনেই ব্রেক কষার কড়া আওয়াজে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সে।

*

যেমন অস্বাভাবিক রোগা, তেমনি ছোটখাট লোকটা। ছোট্ট গোল মুখ, টিকালো নাক। ভাসা ভাসা চোখ। দৃষ্টিতে অদ্ভুত সারল্য। গিলটি মিয়া। পরনে চকলেট রঙের ট্র্যাক স্যুট। ভুরু কুঁচকে যথাসম্ভব দ্রুত পা চালাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হয় কারও ওপর চটে আছে মনে মনে।

আসলেই তাই। ভীষণ চটে আছে গিলটি মিয়া। বেহায়া, বেলেহাজ, বেতমিজ ইংরেজদের ওপর। আরে বাবা, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পেরোলেই যে বচর ঘোরে, এ তো জানা কতা। তাই লিয়ে এত হাঙ্গামা-হুজ্জতের কী আচে? ভাবছে সে। রাস্তাঘাটে ছোঁড়াছুঁড়ি থেকে শুরু করে বুড়োবুড়িরা পর্যন্ত দলে দলে জটলা করছে। পরিচিত হলে তো কথাই নেই, অপরিচিতরা পর্যন্ত এ-ওর কোমর ধরে এক পাক্ নেচে নিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে চলছে পাইকারি চুমু।

লাজ-লজ্জার বালাই নেই ব্যাটাদের। কেন, আনন্দ প্রকাশ করার কি এছাড়া আর কোন উপায় নেই? তার ওপর একেকজনের পোশাকের কি ছিরি! গায়ে ওগুলো না থাকলেই বরং ভাল লাগত। তাও তো অনেক মানুষই শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেছে লম্বা ছুটিতে। তারা সবাই থাকলে না জানি কি অবস্থা হত লণ্ডনের। ময়-মুরুব্বি দেখাদেখি নেই, ছোটবড় বাছ-বিচার নেই···হ্যাঁ, আপনমনে মাথা দোলাল গিলটি মিয়া।

যাকে বলে সত্যিকার উৎসব, ক্যালকাটায় দেখেছে সে। দুগ্গা পুজো কি হোলি, অথবা ঈদ, বক্‌রি'দ, বড়দিন, উফ্! সে যে কী আনন্দের ব্যাপার ছিল! ওসবের পায়ের কাচেও লাগে না ইংরেজদের এ উৎসব। আচমকা ব্রেক কষল গিলটি মিয়া। ওর পথ আগলে দাড়িয়েছে চার-পাঁচটা উদ্ভট পোশাক পরা যুবক-যুবতী। চুলের দৈর্ঘ্য প্রায় সবারই সমান। কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে, মাঝ বরাবর ভালমত না তাকালে ঠাহর করা মুশকিল।

খুব সম্ভব গিলটি মিয়ার আকার এবং গায়ের রঙ আকৃষ্ট করেছে ওদের। মজা করার জন্যে তার বাঁ কাঁধে হাত রাখল একটি মেয়ে। পুরু মেক আপ্ নিয়েছে মেয়েটি। তার ওপর বাঁ গালে ঐকজোড়া নগ্ন, আলিঙ্গনাবদ্ধ নারী-পুরুষের উল্কি। ডান হাতে ধরা একটা বিয়ারের খোলা ক্যান গিলটি মিয়ার মুখের সামনে নিয়ে এল মেয়েটি।

'কামন, ডার্লিং! হ্যাভ আ সিপ্!'

চট্ করে মুখটা দু'ইঞ্চি পিছিয়ে নিল গিলটি মিয়া। 'ধন্যবাদ। অপাত্রে না ঢেলে ওগুলো তোমার মাতায় ঢালো, মা জননী। মাতা ঠাণ্ডা করো। আর বুকটাও ঢাকো দয়া করে। যে ভাবে উদোম করে রেকেচো, আমার মরা বাপেরও জীবন-যৌবন ফিরে আসবে দেকে।'

বুঝল না কেউই কিছু, তবুও হেসে উঠল সবাই। কাঁধের হাতটা আলতো করে সরিয়ে দিল গিলটি মিয়া। নাক কুঁচকে উঠতে চাইছে আপনাআপনি, কষ্ট করে সামলে রেখেছে। 'ছেড়ে দে, মা,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'মুকের দুর্গন্ধে ডেঁড়িয়ে থাকাই দায়।'

এক পা এক পা করে জটলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া। তারপর হন্ হন্ করে হাঁটা ধরল। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিল ও রোজকার মত। ফরসা হওয়ার পর থেকে ইংরেজদের তামাশা দেখতে দেখতে অজান্তেই অনেকটা দূরে চলে এসেছে কখন যেন। অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। তাই ভেতরে ভেতরে খানিকটা ব্যস্ত। চেষ্টা করছে কারও সাহায্য ছাড়াই পথ খুঁজে বের করতে।

আটাশ তারিখ লণ্ডন এসেছে গিলটি মিয়া। ওর জন্যে নতুন নিয়ম করা হয়েছে, রানা এজেন্সির প্রতিটি শাখায় ছ' মাস করে কাজ করতে হবে ওকে। এতে দেশ দেখা যেমন হবে, তেমনি সে সব দেশের মানুষ, ভাষা, আদব-কায়দা ইত্যাদি সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে। ব্রাঞ্চ-

এজেন্টরাও অনেক কিছু শিখবে ওর কাছে। এসব ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

এখানকার অফিশিয়াল কাজ এখনও শুরু হয়নি গিলটি মিয়ার। বড়দিন এবং নববর্ষ উপলক্ষে লম্বা ছুটি চলছে। এজেন্সির এ-দেশি এজেন্টরা প্রায় সবাই অনুপস্থিত। সিকিউরিটি গার্ড আর দু'-চারজন বাঙালি অফিসার ছাড়া কেউ নেই। তাদেরও ফাইল ওঅর্ক ছাড়া করার কিছু নেই তেমন। সবকিছুতে গা ছাড়া গা ছাড়া ভাব। তাই গিলটি মিয়াও মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে গা ছেড়ে।

ক'দিন পর আসছে মাসুদ রানা। প্রধানমন্ত্রীর দফতরে এজেন্সির কী এক জরুরি ফাইল অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, ওটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে খুব শিগগির। সে সময় ওর লণ্ডন উপস্থিতি প্রয়োজন।

আবার ব্রেক কষল গিলটি মিয়া। দু'পাশের বাড়িঘরের দিকে তাকাল। নাহ্! মহাবিরক্তিতে চোখমুখ কোঁচকাল ও। আবারও ভুল পথে এসেছে। এদিক-ওদিক তাকাল। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিস কনস্টেবলের ওপর চোখ পড়ল। হল্লারত একদল যুবতীর দিকে চেয়ে আছে হাঁ করে। তার কাছ থেকে পথের হদিস জেনে নিলে কেমন হয়?

থাক, ভাবল গিলটি মিয়া। আরাকবার চেষ্টা করে দেকি। তারপর নাহায় জিজ্ঞেস করা যাবে। আবার পা চালাল ও। জটলা দেখলেই চোখ কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ভাবখানা, করগে তোদের যা মন তাই। মিনিট পাঁচেক চলার পর বুঝল গিলটি মিয়া, এবারও ভুল পথেই এসেছে সে। গতি মন্থর হয়ে এল। থেমে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় ঠিক পিছনেই ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে চমকে উঠল।

লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। পরক্ষণেই একটা ট্যাক্সি থেকে উড়ে বেরিয়ে এল তালগাছের মত লম্বা কে একজন, জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। হতভম্ব হয়ে পড়ল ও। হড়বড় করে কী যেন বলছে

তালগাছ। কানে আসছে ঠিকই, কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। কোন্ ভাষা ওটা?

'...চিনতে পারছেন না, ওস্তাদ! আমি প্রেসটন, জিম প্রেসটন!' কানের কাছে পরিষ্কার বাংলায় লাউড স্পীকারের মত চেঁচাচ্ছে লোকটা। 'ওস্তাদ, আমি বউবাজারের সেই প্রেসটন।'

এবার স্বর ফুটল গিলটি মিয়ার। ট্যাক্সি ড্রাইভার হাঁ করে দেখছে ওদের। পথচারীরাও ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। 'আরে আরে, ছাড়ুন! কি করচেন, ছাড়ুন!'

আল্‌তো করে গিলটি মিয়াকে নামিয়ে দিল প্রেসটন। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে চেয়ে আছে। আনন্দ যেন উপ্‌চে পড়ছে তার দু'চোখ দিয়ে। আবার বলল সে, 'ওস্তাদ, আমি প্রেসটন।'

এবার বুঝল গিলটি মিয়া। মুখ তুলে তাকে দেখছে তো দেখছেই। 'আ-আপনি...মানে, তুমি...পেস্‌টন! ক্যালকাটার পেস্‌টন?'

'হ্যাঁ, ওস্তাদ,' হাসি দু'কান স্পর্শ করল তার। অভিভূতের মত কতক্ষণ ওস্তাদের দিকে চেয়ে থাকল সে। 'আজ আমার এমন সুদিনে আপনার দেখা পেলাম, কি যে আনন্দ হচ্ছে, ওস্তাদ! আমার ভাগ্যটা সত্যিই ভাল।'

গিলটি মিয়া কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। বিস্ময়ের ঘোর এখনও তার কাটেনি। সেই এতটুকুন পেস্‌টন, যাকে ক্যালকাটায় নিজহাতে মহাবিদ্যা শিখিয়েছে সে, আজ এত বছর পর কি না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসে লণ্ডনে তার সঙ্গে দেকা? ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে ঠিক ভরসা হচ্ছে না।

'আসুন আমার সাথে,' তার বাহু ধরে আকর্ষণ করল জিম প্রেসটন।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, কোতায়...'

'যেখানে আমি নিয়ে যাব।'

'কিন্তু...' শিস্যের কথার তোড়ে বাকি কথা বলার ফুরসত পেল না

গিলটি মিয়া।

'কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। আগে গরীবখানায় চলুন, তারপর শুনব আপনার কথা।'

প্রায় টেনে হিঁচড়ে ট্যাক্সিতে তুলল তাকে জিম প্রেসটন। রওনা হয়ে গেল ট্যাক্সি ওয়াটারলু ব্রিজের দিকে। সারাপথ একাই বক্ বক্ করল প্রেসটন, গিলটি মিয়াকে মুখ খোলার বিশেষ একটা সুযোগ দিল না। তার ফ্ল্যাটে পা রেখে থমকে গেল গিলটি মিয়া। অবাক বিস্ময়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ঘরগুলো। 'এই তোর গরীবখানা?'

হাসল প্রেসটন। 'এইবার বোঝা গেল সত্যিই চিনেছেন আপনি আমাকে।'

'মানে?'

'তখন থেকে তো কেবল একবার আপনি একবার তুমি করে আসছেন।'

'এই কতা? তা তুই কি আর আগের মতন ছোটটি আচিস? অতবড় জোয়ান মরদকে কি চাইলেই তুই তুকারি করা যায়?'

'শুরু যখন একবার করেই ফেলেছেন, চালিয়ে যান। আপনার মুখে ওসব সম্বোধন মোটেই ভাল লাগে না, ওস্তাদ। কেমন পর পর মনে হয় নিজেকে।'

শিষ্যটি তার আগের মতই বিনয়ী আছে বুঝতে পেরে আটাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি আরও দু'ইঞ্চি প্রসারিত হলো গিলটি মিয়ার।

'বাদ দিন ওসব, কি খাবেন বলুন। খিদে পেয়েছে নিশ্চই?'

এইবার খেয়াল হলো গিলটি মিয়ার, ন'টা বাজতে চলেছে, এখনও পেটে কিছু দেয়ার সুযোগ হয়নি। 'পেয়েচে মানে? সেই ভোর সক্কাল থেকে রাস্তা হারিয়ে কানা মুরগির মতন ইদিক-উদিক ঘুরে মরচি। পেটে ধাড়ি ছুঁচোর কেত্তন চলচে।'

'পথ হারিয়েছিলেন!' বিস্মিত হলো জিম। 'সে কি!'

'তবে আর বলচি কি?' পেটে হাত বোলাল গিলটি মিয়া।

'আচ্ছা এখন থাক। পরে শুনব। আগে খাবারের ব্যবস্থা করি,' কিচেনের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল সে। খাবার ব্যাপারে গুরুর কড়া বাছ-বিচারের কথা মনে পড়ে গেছে। 'ওস্তাদ, আপনার জন্যে...?'

'সেদ্ধ ডিম আর কলা। আচে না?'

'অবশ্যই। সঙ্গে কফি, না চা?'

'নির্ভেজাল সাদা পানি।'

নাশতা সেরে সীটিংরূমে এসে বসল ওরা। 'তুই তাহালে একনও টায়াড?' প্রশ্ন করল গিলটি মিয়া।

বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকল জিম প্রেসটন।

'বুজলিনে? থ্রী সেবেনটি নাইনের কতা বলচি, একনও চলচে ওসব? আমি বাপু রিটায়াড, ছেড়ে দিয়েচি।'

হেসে উঠল প্রেসটন। অকপটে নিজের বর্তমান পেশা সম্পর্কে জানাল গিলটি মিয়াকে। 'এখন বেশ ভাল আছি, ওস্তাদ। একটা দান মারতে পারলেই বেশ কিছু দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। অনেক ভাল আছি আগের চেয়ে।'

'সে তো বুজতেই পারচি,' ঘরের চারদিকে নজর বোলাল সে। 'সুদিন সম্পর্কে তকন কি যেন শুনলুম? কিসের সুদিন?'

'আজ রাতে খুব বড় একটা দাঁও মারতে যাচ্ছি, ওস্তাদ। খুব বড় দাঁও!'

'যা। সাবধান থাকিস। পেচনে একটা চোক রাকবি সব সোমায়,' ডান হাত তুলল গিলটি মিয়া শিস্যকে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে।

'এমন দিনে আপনার দেখা পেলাম, বুকের বল অনেক বেড়ে গিয়েছে, ওস্তাদ।'

আরও আধ ঘণ্টা গল্প-গুজব করে আসন ছাড়ল ওস্তাদ। 'এবার যেতে হয়। দেরি হয়ে গেচে।'

'সে কি!' আকাশ থেকে পড়ল জিম। 'কোথায় যাবেন?'

হেসে ফেলল গিলটি মিয়া। 'যেকেনে যেতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলুম, সেকেনে।'

বেকুবের মত চেহারা হলো প্রেসটনের। 'তাই তো! কিন্তু, ওস্তাদ, আপনি এখানে কেন, কি কাজে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন, কিছুই তো জানা হলো না।'

'বলব, বলব। কিন্তু আজ নয়, সোমায় নেই। আরাকদিন।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল জিম প্রেসটন। 'আরেকদিন নয়, ওস্তাদ। কালই আসূন, একটা জিনিস দেখাব আপনাকে। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, অমন জিনিস আগে কখনও দেখেননি আপনি।'

'জিনিসটা কি?'

'উঁহুঁ, বলব না। দেখাব।'

একটু ভেবে রাজি হয়ে গেল গিলটি মিয়া। 'ঠিক আচে। আসবো।'

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কুনো দরকার নেই। একাই যেতে পারব আমি ট্যাক্সি লিয়ে।'

দুই

ঘরে ফিরে নিজের জন্যে এক কাপ এসপ্রেসো তৈরি করল প্রেসটন। মনটা খুশি খুশি লাগছে। জন্মের পর বহু বছর কোলকাতায় কেটেছে তার। সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক কারণেই হোক বা আর যেভাবেই হোক, ছেলেবেলা থেকেই মনের ভেতর বেশ কিছু সংস্কার স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে তার ভারতীয়দের মত। জিম প্রেসটনের স্থির বিশ্বাস, এমন দিনে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে শিক্ষাগুরুর দর্শন পাওয়া গেছে, তখন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, গ্লেন ডায়মণ্ড চুরির স্বপ্ন আজ সত্যি সত্যিই বাস্তবায়িত হবে তার।

এসপ্রেসো পান করতে করতে একটা স্কেচের ওপর চোখ বোলাতে বসল জিম। তার শিক্ষানবিস বিল সাইমনের আঁকা। বিল বয়সে কিশোর। কাজ যত কঠিনই হোক, জটিল হোক, পিছ পা হতে জানে না। লেগে থাকে আঠার মত। শেখার আগ্রহের কমতি নেই। জিমের ধারণা, ভবিষ্যতে বিলও তারকা হতে পারবে এ লাইনে।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে সাইমনকে ফন্টেনয় অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে পাঠিয়েছিল জিম প্রেসটন। অত্যন্ত দামী বিশাল এক ফুলের তোড়া নিয়ে। ব্লকের আটতলায় থাকেন ফিলবি-ফেডোরা দম্পতি। ডোরবেলের শব্দ শুনে স্বয়ং লেডি ফেডোরা দরজা খুললেন। সামনে নিষ্পাপ চেহারার বিল

সাইমনের হাতে তোড়াটা দেখে বিস্ময়ে, খুশিতে হেসে উঠলেন মহিলা। ‘ওহ্, হাউ লাভলি!’

তোড়ার ভেতর রাখা প্রেরকের নেমকার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লেন তিনিঃ কমিটি অভ দ্য ডিসট্রেস্‌ড ভেটেরানস্ বেনেভোলেন্ট ফাণ্ড। এরকম অজস্র সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক লেডি ফেডোরা। প্রায় নিত্যই এ ধরনের সৌজন্য উপহার এক আধটা গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। কালও নিলেন। তোড়াটা সামলে ধরার কসরৎ করছেন ফেডোরা, এই সময় বেয়ারার ছেলেটা প্রাপ্তি রসিদ এবং একটা বল পেন এগিয়ে দিল।

একসঙ্গে এত কিছু করা অসম্ভব, তাই সাইমনের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসলেন হার লেডিশিপ। ‘এক মিনিট, প্লীজ!’ তোড়া নিয়ে সীটিংরূমের দিকে ছুটলেন তিনি। খুদে হলওয়েতে কয়েক মুহূর্ত একা থাকার সুযোগ পেয়ে গেল বিল সাইমন। দ্রুত দরজার ফ্রেমের ওপর শকুন চোখ বোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে এই ফাঁকে। ফ্রেমের ভেতরদিক এবং আশপাশের দেয়ালে কোন বাযার বা সুইচ আছে কি না নিশ্চিত হতে চায়।

কাজটা পুরো হওয়ার আগেই ফিরে এলেন লেডি ফেডোরা। সাইমনের হাত থেকে স্লিপ এবং কলম নিয়ে সই করতে গেলেন। কিন্তু আঁচড় পড়ছে না কলমের। কালি নেই। নেই করেই ওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে বিল। লেডিকে বিব্রত হতে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল সে, বারবার করে ক্ষমা চাইতে লাগল। ফেডোরার হাসিটা প্রশস্ত হলো তার অবস্থা দেখে। ‘দ্যাটস অল রাইট, মাই বয়। আমার হাতব্যাগে একটা পেন আছে মনে হয়। দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কি না,’ ঘুরে দ্রুত পা চালাতে চালাতে বললেন, ‘একটু অপেক্ষা করো।’

ব্যগ্র দৃষ্টিতে আবার কাজে লেগে পড়ল বিল সাইমন। এবং মুখ তুলতেই নজর পড়ল জিনিসটার ওপর। দরজার পাল্লার সঙ্গে, হিঞ্জের

সামান্য ওপরে, চিরুনির মোটা দাঁতের মত, আধা ইঞ্চি কি তারও ছোট একটা প্লানজার কন্ট্যাক্ট ফিট করা আছে। ওদিকে ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে খুদে একটা সকেট। দরজা বন্ধ হলে সকেটে প্রবেশ করবে প্লানজার, অ্যাকটিভেট হবে ওটা অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করলেই। সকেটের ভেতর, জানা আছে নিষ্পাপ বিলের, আছে একটা মাইক্রোসুইচ।

প্লানজার যতক্ষণ ওই সুইচের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, ততক্ষণ সব ঠিক আছে। কিন্তু যেই ও দুটো বিচ্ছিন্ন হবে পরস্পর থেকে, অর্থাৎ দরজা খোলা হবে, বেজে উঠবে অ্যালার্ম। অবশ্য ওটা চালু না থাকলে অন্য কথা। বেজে ওঠার আগে ত্রিশ সেকেণ্ড মৃদু 'পিপ্...পিপ্' শব্দে জানান দেবে সে। এর মধ্যে মাস্টার সুইচ অফ করতে হবে ঘরের মালিককে।

বাকি কাজটুকু সারতে মাত্র তিন সেকেণ্ড সময় লাগল বিল সাইমনের। পকেট থেকে সুপারগ্লুর একটা টিউব আর খুদে একটা প্লাস্টিসিন বল বের করল সে। বলটা সকেটে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা গ্লু ঢেলে দিল তার ওপর। একটু পর বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে জায়গাটা চাপ দিয়ে পরখ করে দেখল সে। লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। প্লানজার ঢুকতে পারবে না এখন আর ভেতরে। মাইক্রোসুইচের সঙ্গে সংযোগ ঘটার উপায় রইল না ওটার।

অকেজো হয়ে গেল অ্যালার্ম সিস্টেম। যতক্ষণ না প্লানজার আবার সকেটে ঢোকার পথ পাবে, ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিট টেরই পাবে না কখন দরজা বন্ধ হলো কি খুলল। সই করা রসিদ নিয়ে ফিরে এলেন লেডি ফেডোরা। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সাইমন। সিধে হলো সে। কাগজটা নিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এল।

স্কেচে পরিষ্কার করে ওই অ্যাপার্টমেন্টের এন্ট্রান্স, পোর্টার'স লজ ইত্যাদির এবং সিঁড়ি ও এলিভেটরের লোকেশন এঁকেছে বিল সাইমন।

খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেয়নি। চোখে যা যা দেখেছে তার সবই স্থান পেয়েছে স্কেচে। কফিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবল প্রেসটন, যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই অ্যালার্ম সিস্টেম অন্ করে রেখে গেছেন ফিলবি।

হাসি পেল। বিলের কাছে শুনেছে, দরজায় দুটো তালা দেখেছে সে। দুটো কেন, চারটে হলেও কিছু আসে যায় না। সময় খানিকটা বেশি নষ্ট হবে, এই যা। তাতে অসুবিধে নেই। কেউ দেখে ফেলবে, তেমন কোন চান্সও নেই। কারণ সিঁড়ি বা এলিভেটর, দু'টোই অ্যাপার্টমেন্টের ফ্রন্ট ডোর থেকে দূরে এবং চোখের আড়ালে।

তবে এ ধরনের পয়সাওয়ালাদের বাসস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে প্রেসটন। সে নিশ্চিত, কেবল অ্যালার্ম বা তালাই নয়, আরও দু'চারটা ফাঁদ অবশ্যই আছে ভেতরে। সে সবের মোকাবেলার জন্যেও প্রস্তুত সে। কফি শেষ করে একটা নিউজ পেপার কাটিঙের ফাইল বের করল জিম। অন্য সব তারকা রত্নচোরের মত সে-ও সচিত্র সোসাইটি গসিপ্ কলামের নিয়মিত পাঠক-সংগ্রাহক।

এই ফাইলটি সম্পূর্ণ লেডি ফেডোরা এবং তাঁর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সম্পর্কিত। এ সব অনুষ্ঠান মর্যাদার লড়াইয়ের স্থান। প্রতিটি লড়াইতেই জিত হয়েছে ফেডোরার, যার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে তাঁর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া গ্লেন ডায়মণ্ডের অলঙ্কার সেটের।

সবার ওপরের ছবিটির দিকে চেয়ে থাকল প্রেসটন। সর্বশেষ পেপার কাটিং এটা। প্রিন্স চার্লস পত্নী লেডি ডায়ানার সঙ্গে বাকিংহাম প্যালেসের এক পার্টিতে হাস্যোজ্জ্বল লেডি ফেডোরাকে দেখা যাচ্ছে। এদিনও ডায়মণ্ডের সেটটি পরেছিলেন ফেডোরা। জিম প্রেসটনের মুখস্থ এই ডায়মণ্ডগুলোর ইতিহাস।

১৯০৫ সালে মার্গটের তরুণ আর্ল দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করে ফেরার

পথে চারটে আনকাট পাথর নিয়ে আসেন দেশে। ১৯১২ সালে বিয়ে করেন আর্ল। তার কিছুদিন আগে কার্টার অভ লণ্ডনকে পাথরগুলো কেটে আকার দেয়ার দায়িত্ব দেন তিনি। নববধূর জন্যে ওগুলো দিয়ে অলঙ্কার তৈরি হবে। সে সময়ে আমস্টার্ডামের আশারস্ ছিল সেরা ডায়মণ্ড কাটার। কাটিঙের কাজটা তাদের ওপর অর্পণ করে কার্টার।

টানা দু'মাস পরিশ্রম করে পাথরগুলোকে দু'জোড়া চমৎকার আটান্ন ফ্যাসেটের নাশপাতির আকার দেয় আশারস্। একজোড়ার প্রতিটির ওজন দাঁড়ায় দশ ক্যারেট, অন্য জোড়ার বিশ ক্যারেট। এরপর পাথরগুলো লণ্ডন নিয়ে আসে কার্টার বাকি কাজ সারার জন্যে। তারা সাদা সোনা ও অনেকগুলো ছোট ছোট ডায়মণ্ডের সমন্বয়ে ছোট দুটো দিয়ে চোখ ঝলসানো ইয়ার রিঙ এবং অন্য দুটো দিয়ে কম্পোজড্ টায়রা তৈরি করে।

অলঙ্কার গড়ার কাজ শেষ হওয়ার আগেই আর্লের বাবা, শেফিল্ডের সপ্তম ডিউক মারা যান। আর্ল হন পরবর্তী ডিউক। তাঁদের বংশের উপাধি ছিল গ্লেন, সেই সূত্রে ডায়মণ্ডগুলোও লোকের মুখে মুখে গ্লেন নামে ফিরতে থাকে। কালে ওটাই হয়ে যায় ওগুলোর পরিচয়। ১৯৩৬ সালে মারা যান অষ্টম ডিউক। এক ছেলে ছিল তাঁর।

এঁর দুই ছেলে মেয়ে। ছেলের জন্ম ১৯৪৪ এবং মেয়ের ১৯৪৯ সালে। লেডি ফেডোরাই সেই মেয়ে। শেফিল্ডের নবম ডিউকের কন্যা, দশম ডিউকের ছোট বোন। মেয়েকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসতেন নবম ডিউক, তাই মৃত্যুর আগে ডায়মণ্ডগুলো তাঁকেই দিয়ে যান তিনি। এতে তাঁর ভাইয়ের কোন আপত্তি ছিল না।

ছবির ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে লাগল জিম প্রেসটন। 'ওগুলো পরার সৌভাগ্য আর কোনদিনও হবে না তোমার, ডিয়ার লেডি,' বিড়বিড় করে বলল সে।

*

রাত ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত ফন্টেনয় হাউসের উল্টোদিকের কার পার্কে বসে থাকল প্রেসটন আরেকটা ভাড়া করা গাড়িতে। এ মুহূর্তে চমৎকার ছাঁটের দামী কাপড়ের ডিনার স্যুট পরে আছে সে। পাশের সীটে রাখা বড়সড় রিবন বো বাঁধা এক বোতল বিখ্যাত কোম্পানির শ্যাম্পেন। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রেসটন বাড়িটির দিকে। সবগুলো ফ্লোরে আলো জ্বলছে, জ্বলছে না কেবল আটতলায়।

প্রতি তলাতেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। দশটার পর থেকে একে একে পৌঁছতে শুরু করল অভ্যাগতরা। ক্রমেই বাড়ছে ভিড়। দশটা পাঁচে গাড়ি ত্যাগ করল জিম প্রেসটন। বাঁ হাতের চিত করা তালুতে শ্যাম্পেনের বোতলটা ধরে দৃঢ় পায়ে রাস্তা পার হলো। সোজা এসে দাঁড়াল ফন্টেনয় হাউসের লবিতে। হাতের ডানে পোর্টার'স লজ, ঠিক যেমনটি এঁকেছে সাইমন স্কেচে। কোমর সমান উঁচু কাঁচের জানালার ওপাশে নাইট পোর্টারকে দেখা গেল, এক চোখ সামনের টিভির পর্দায়, অন্যটা প্রবেশ পথের ওপর।

জিম প্রেসটনকে দেখে উঠে এল লোকটা। মনে হলো কিছু বলবে। কিন্তু লোকটাকে সুযোগ দিল না সে। 'ইভনিং,' হাসি ফুটল জিমের চোখে মুখে। একই সঙ্গে পা বাড়াল এলিভেটরের উদ্দেশে। 'ওহ, অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার।'

প্রশ্ন করার কথা ভুলে গেল পোর্টার। বিনয়ে গলে গেল। 'থ্যাংক ইউ, স্যার। হ্যাপি নিউ ইয়ার!' সত্যিই প্রেসটনকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সে কোন ফ্লোর তার গন্তব্য। কিন্তু সামলে নিল। অমন দামী পোশাক-আশাক পরা একজন ভদ্রলোককে সরাসরি প্রশ্নটা করতে বাধল। অন্য দিন হলে প্রশ্নটা অবশ্যই করত সে। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আট-নয়টা

ফ্লোরে নিউ ইয়ার'স পার্টি আছে, ভদ্রলোক যে-কোন ফ্লোরের গেস্ট হতে পারেন। ফিরে গিয়ে টিভি দেখায় মন দিল সে।

লিফটে ওঠার আগে পিছনে চাইল একবার জিম প্রেসটন। ওর সঙ্গী হওয়ার জন্যে নেই কেউ। তাই চাইছিল সে। মৃদু শিস বাজাতে বাজাতে সেভেনথ্ ফ্লোরে উঠে এল জিম। পা চালিয়ে ফিলবি-ডেবোরার ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে দরজার ফ্রেম এবং সংলগ্ন দেয়ালে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল। এক সময় মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট মনে। ঠিকই দেখেছে বিল, কোন বাযার নেই। দুহাতে দস্তানা পরে নিল সে।

এবার দরজার তালায় মন দিল জিম প্রেসটন। বিশ ইঞ্চি ব্যবধানে দুটো তালা, একটা সাব মরটিজ, অন্যটা সেলফ ক্লোজিং ইয়েল লক। ভাল কী-ম্যানের জন্যে পরেরটা খুব একটা কঠিন সমস্যা নয়। তবে সাবটা ভোগাবে বেশ! হুইস্কির বোতল নামিয়ে রাখল জিম প্রেসটন, তারপর পকেট থেকে নিজের তৈরি বারোটা স্কেলিটন চাবির একটা গোছা বের করল।

প্রথমে সাব নিয়েই পড়ল। একটা একটা করে ভেতরে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। ষষ্ঠ চাবিটা পছন্দ হলো জিমের, খুব সহজেই ভেতরে প্রবেশ করেছে ওটা। এবার খুব আস্তে আস্তে ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল চাবিটা। ভেতরের কোথায় কোথায় প্রেশার পয়েন্ট আছে অনুমান করার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ পর থামল সে, মনে হলো পয়েন্টগুলো ট্রেস করতে সক্ষম হয়েছে। এবার হাঁটু গেড়ে বসে সরু একটা ফাইল দিয়ে নরম ধাতুর স্কেলিটনের ওপর কাজ শুরু করল প্রেসটন।

এগারোটা পাঁচে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে অন্ধকার। কিন্তু করিডরের আলোয় মোটামুটি দেখা যায় হলওয়ের আউটলাইন। চলে এল সে ভেতরে। বন্ধ করে দিল দরজা। কিন্তু তখুনি নড়ল না দরজা ছেড়ে। হলরুমটা আট ফুট বাই আট ফুট। পুরোটাই পুরু কার্পেট মোড়া। সন্দেহ

করল প্রেসটন, নিশ্চয়ই এর নিচে কোথাও প্রেশার প্যাড আছে। থাকতেই হবে।

তবে দরজার খুব একটা কাছে থাকার সম্ভাবনা কম। তাতে ঘরের লোকেরও প্যাড মাড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। নিঃশঙ্ক চিত্তে আলো জ্বালল জিম প্রেসটন। বাঁ দিকে আধখোলা একটা দরজা, ওপাশে ল্যাভেটরি। ডানে আরেকটা দরজা—ক্লোক রুম। অ্যালার্ম কন্ট্রোল সিস্টেমটা ওই রুমেই, নিশ্চিত জানে সে। কিন্তু ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

হিপ পকেট থেকে একজোড়া প্লায়ার্স বের করে কার্পেটের এক কোনা তুলল জিম, সরে খালি ফ্লোরের ওপর দাঁড়াল। এক মিনিটের মধ্যে প্যাডটা আবিষ্কার করে ফেলল সে। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে ওটা। একটাই। কার্পেট ছেড়ে দিল প্রেসটন, জায়গাটাকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে সীটিংরুমের দরজা খুলল এসে। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল আলোর সুইচের খোঁজে।

ঘরটা আয়তাকার। আঠারো বাই পঁচিশ হবে অনুমান। হাতের ডানেই রয়েছে সুইচ। প্রচুর ঝুঁকি আছে জেনেও হাত বাড়িয়ে খুব সাবধানে আলো জ্বালল সে। সামনের রুমে জানালা ছিল না, বাইরে থেকে ভেতরের আলো দেখার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এ ঘরে আছে। নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে আলো যাচ্ছে বাইরে। কিন্তু প্রেসটন নিরুপায়। বুবি ট্র্যাপে ভরা কোন রুমে পেন্সিল টর্চ জ্বেলে কাজ করতে রাজি নয় সে। তাছাড়া যখন জানাই আছে যে এ-ফ্ল্যাটের মালিক শহরে নেই, এ মুহূর্তে তার ফিরে আসারও কোন কারণ নেই, তখন দুশ্চিন্তারও কিছুই নেই।

অত্যন্ত দামী, রুচিশীল আসবাবে সাজানো ঘরটা। সামনের ঘরের চাইতেও পুরু এ ঘরের কার্পেট। সম্ভবত অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে ওটা ঘরের মাপে। এক ইঞ্চি ফ্লোরও দেখার উপায় নেই। প্রেসটনের ঠিক

সামনেই ভারি কার্টেন ঝুলছে। জানালা নিশ্চয়ই। ডানে ছোট পাথরের ফায়ার প্লেস। তার পাশে একটা বন্ধ দরজা। ওটা বোধহয় মাস্টার বেডরূম, অনুমান করল জিম প্রেসটন।

বাঁয়ে দুটো দরজার একটা বন্ধ, অন্যটা খোলা। ফাঁক দিয়ে বিশাল ডাইনিং টেবিলের এক প্রান্ত দেখা যায়। ঝাড়া দশ মিনিট একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জিম প্রেসটন। কেবল চোখ দুটো ঘুরছে অনবরত, চার দেয়াল আর সিলিঙ পরীক্ষা করছে। এর কারণ আছে। ভেতরে স্ট্যাটিক মুভমেন্ট অ্যালার্ম সেট করা থাকতে পারে। দেহের উত্তাপ বা নড়াচড়া সনাক্ত করতে পারলেই বেজে উঠবে তা বিকট শব্দে।

শক্ত হয়ে থাকা পেশীতে ঢিল দিল জিম প্রেসটন। নেই ওসব। থাকলে বেজে ওঠার কথা এতক্ষণে। তৈরিই ছিল সে। তেমন কিছু ঘটলে তিন সেকেণ্ডে পৌঁছে যেত করিডরে। তারপর ভাগলবা। কিন্তু তাই বলে বিপদ পুরোপুরি কাটেনি এখনও। প্রেশার প্যাড তো রয়েইছে, টাচ্ বেলও আছে হয়তো এ ঘরে। ছুঁয়ে ফেললেই শেষ। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে কিছু স্পর্শ করা যাবে না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জিম প্রেসটন।

সেফটা হয় এ-রূমে, নয়ত মাস্টার বেডরূমে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। এবং অবশ্যই বহির্দেয়ালের গায়ে বসানো। কারণ সেফ ধরে রাখার মত চওড়া নয় ভেতরের দেয়ালগুলো। এগারোটা বিশে সেফটা সনাক্ত করতে সক্ষম হলো জিম প্রেসটন। সীটিংরূমে, ওর নাক বরাবর সোজা, প্রশস্ত একজোড়া ডবল-গ্লেজড্ পিকচার উইণ্ডোর মাঝের ফাঁকা দেয়ালে ঝুলছে বড় একটা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়না। ওটার পিছনে।

যেমনটি থাকার কথা, দেয়ালের সঙ্গে ঠেকে নেই আয়নার পিঠ। বরং ইঞ্চি দেড়েক ফাঁক আছে দুটোর মাঝখানে। ফাঁকটা কেন রয়েছে বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না জিম প্রেসটনের। মুচকে হেসে প্লায়ার্স জোড়া বের করল

সে। ফ্লোর থেকে টেনে তুলে ফেলল কার্পেটের সবচেয়ে কাছের প্রান্ত, তারপর এক পা দু পা করে এগিয়ে চলল আয়নার দিকে ওটা সরিয়ে সরিয়ে।

আয়নাটার ঠিক নিচেই রয়েছে এ ঘরের একমাত্র প্রেশার প্যাডটি। এক মুহূর্ত ভাবল জিম। তারপর দরজার কাছে ফিরে গিয়ে ঘুরে ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখা একটা কফি টেবিল তুলে নিয়ে এল। দুই ফুট বাই দেড় ফুট প্রেশার প্যাডটার ওপর বসিয়ে দিল ওটা। টেবিলের চার পায়া প্যাডের বেশ দূরে দূরে সেট হয়েছে, চাপ পড়ার কোন চান্সই নেই।

এবার দেয়াল আর আয়নার সংযোগস্থানের দিকে নজর দিল প্রেসটন। আয়নার পিছনে ফিট করা আছে বড় একটি ম্যাগনেটাইজড্ স্টীলের খণ্ড। ওদিকে দেয়াল থেকে সামান্য বেরিয়ে রয়েছে একটি শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ক্যাচ্। ওই ক্যাচ্ই ধরে রেখেছে আয়নাটিকে। অ্যালার্ম ম্যাগনেট। আয়নাটা খুললেই বেজে উঠবে। অতএব স্টীলের খণ্ডটির সঙ্গে সংযোগ ছুটে গেছে, ব্যাপারটা টের পেতে দেয়া যাবে না চুম্বক বাবাজীকে।

এ জন্যেও তৈরি জিম প্রেসটন। বুক পকেট থেকে চার বাই চার ইঞ্চি এক খণ্ড ম্যাগনেটাইজড্ স্টীল পাত বের করে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে দেয়ালের চুম্বক আর আয়নার স্টীলের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর বাঁ হাতে পাতটা চুম্বকের সঙ্গে ঠেসে ধরে অন্য হাতে হ্যাঁচকা টানে আয়নাটা খসিয়ে আনল। আয়না সরে গেলেও কিছুই টের পেল না চুম্বক পাতটির কারণে।

হাসি ফুটল জিম প্রেসটনের মুখে। ওয়াল সেফটা চমৎকার একটা হামবার মডেল ডি। জানে সে, এর দরজা আধ ইঞ্চি পুরু হাই-টেনসিল, কঠিন ইস্পাতের তৈরি। হিঞ্জের জায়গায় আছে মোটা রড, সেফের সিলিঙ এবং ফ্লোরের মাঝে সেঁধিয়ে আছে তার দু'মাথা। এর তালাও তেমনি।

তিনটে হার্ডেনড্ স্টীলের লিভার, ডোর ফ্রেমের দেড় ইঞ্চি গভীরে ঢুকে থাকে বন্ধ অবস্থায়।

দরজার ভেতর দিকে রয়েছে টিনপ্লেট বক্স, লকিঙ লিভার কন্ট্রোলার। আর বাইরে, জিম প্রেসটনের দিকে চেয়ে রয়েছে চমৎকার দেখতে একটি তিন চাকার হুইল কম্বিনেশন লক। কিন্তু তালা খোলার ঝামেলায় আজ আর যাবে না সে। যা করবে সরাসরি। দরজার হিঞ্জ সাইডের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত উড়িয়ে দেবে বিস্ফোরকের সাহায্যে। তাতে যদিও দরজাটা পুরোপুরি খোলা সম্ভব হবে না, তবে যেটুকু ফাঁক সৃষ্টি হবে, ওতেই চলে যাবে কাজ।

শ্যাম্পেনের বোতলটা কফি টেবিলের ওপর রাখল জিম প্রেসটন। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুলে ফেলল ওটার তলা। ফলস্ বোতল। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়া জিনিসগুলোর ওপর নজর বোলাল সে। কটন উলে যত্নের সঙ্গে মুড়ে রাখা একটা ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটর, ছোট ছোট কয়েক খণ্ড চুম্বক, নিত্য ব্যবহার্য ফাইভ এএমপি তারের খুদে একটা রীল এবং ইংরেজি 'ভি'-এর মত দেখতে একখণ্ড ধাতব, সিএলসি। চার্জ লাইনার কাটিং।

জিনিসটা শক্ত, তবে ইচ্ছেমত টেনে লম্বা করা বা সোজা-বাঁকা করা যায়। এক দলা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে মোড়া রয়েছে জিনিসটা। আধ ইঞ্চি পুরু স্টীলের দেয়াল কি করে সহজে কাটা সম্ভব, ভালই জানে জিম প্রেসটন। দ্রুত, দক্ষ হাতে কাজ শুরু করে দিল সে। সিএলসিটাকে টেনে খানিকটা লম্বা করল, তারপর দরজার হিঞ্জ সাইডে সাঁটিয়ে দিল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভে মুড়ে।

ওটার এক মাথায় ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটরটা বসিয়ে দিল সে। ওর এক প্রান্তে দুটো তামার তার, উঠে এসেছে ভেতর থেকে। একটা অন্যটার সঙ্গে লেগে পরে শর্ট সার্কিটের বিপদ যাতে ডেকে না আনে, সে জন্যে তার দুটো টেনে দুদিকে সরিয়ে দিল প্রেসটন। এবার ফাইভ এএমপি তারের এক

প্রান্তের দু'মাথা ভাল করে পেঁচাল তামার তার দুটোর সঙ্গে। ওর অন্য মাথায় আগে থেকেই ফিট করা আছে একটা থ্রী পিন প্লাগ।

এবার তারের রীল খুলে প্লাগ লাগানো প্রান্তটা হাতে নিয়ে মাটিতে চোখ রেখে সাবধানে পিছিয়ে আসতে শুরু করল জিম প্রেসটন। গেস্ট বেডরুমে যাওয়ার করিডরে এসে দাঁড়াল সে। বিস্ফোরণের সময় আড়ালটা প্রয়োজন হবে। প্লাগটা রেখে পকেট থেকে বড় একটা পলিথিন ব্যাগ বের করল প্রেসটন। কিচেনে এসে পানি ভরে ঢোল বানাল ব্যাগটা।

ওটা নিয়ে সেফের সামনে ফিরে এল, সেফের ঠিক ওপরেই একটা থাম্ব ট্যাক লাগিয়ে তার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল ব্যাগটা। সেফের ডালা পুরোপুরি আড়ালে পড়ে গেছে ওটার। বিনে পয়সার শক্ অ্যাবজরবার। পানির মত শক্ অ্যাবজরবার আর হয় না। করিডরেই পাওয়া গেল একটা প্লাগ পয়েন্ট। সুইচটা অফ আছে কি না চেক করে প্লাগটা পয়েন্টে ঢুকিয়ে দিল প্রেসটন।

ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। মাথার ওপরে, পায়ের নিচে নিউ ইয়ার'স পার্টির হল্লা ক্রমেই বাড়ছে। অংশগ্রহণকারীদের দুম্-দাম্ নাচ আর চেঁচামেচি বন্ধ ঘরে থেকেও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। সীটিংরুমে এসে টিভির সুইচ অন করে দিল প্রেসটন। এবার অপেক্ষার পালা। ক্রমেই বাড়ছে পার্টির হল্লা। অসহ্য লাগছে। বারোটা বাজতে এক মিনিট থাকতে যেন যাদুমন্ত্রবলে আচমকা থেমে গেল সব আওয়াজ। এখন টিভির ঐতিহ্যবাহী স্কটিস গান শুনতে পাচ্ছে জিম। অথচ পাঁচ হাতের মধ্যে থেকেও এতক্ষণ একটা অক্ষরও কানে প্রবেশ করেনি তার।

হঠাৎ করেই অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। পর্দায় ভেসে উঠল পার্লামেন্ট হাউসের মাথায় বসানো বিশাল বিগ বেন ঘড়ি। প্রেসটন জানে, সমগ্র ব্রিটেনবাসী এই মুহূর্তে যার যার পানীয়ের গ্লাস মাথার ওপর তুলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে টিভির পর্দায় চোখ রেখে। আর কয়েক সেকেণ্ড পরই

বিস্ফোরিত হবে তাদের কণ্ঠ। বারোটা বাজতে পনেরো সেকেণ্ড বাকি থাকতে একজন ধারা বর্ণনাকারীর মুখ ভেসে উঠল বিগ বেনের পাশে। কাউন্ট ডাউন করছে।

দ্রুত করিডরে এসে প্লাগ পয়েন্টের সামনে বসে পড়ল প্রেসটন হাঁটু গেড়ে। কাউন্ট ডাউন শেষ। সামান্য বিরতি। তারপরই শোনা গেল বিগ বেনের মেঘ ডাকার মত গম্ভীর 'ডঙ-ঙ-ঙ-ঙ-ঙ! ডঙ-ঙ-ঙ-ঙ-ঙ!' একই সঙ্গে হাইড্রোজেন বোমা পড়ল যেন ফন্টেনয় হাউসের মাথায়। জিম প্রেসটনের কানে পর্যন্ত পৌঁছল না সিএলসি বিস্ফোরণের আওয়াজ।

এক মিনিট অপেক্ষা করে প্লাগ বের করে নিল সে পয়েন্ট থেকে। তার পেঁচাতে পেঁচাতে ফিরে চলল সেফের কাছে। অতবড় প্লাস্টিকের ব্যাগ বা ভেতরের পানির কোন চিহ্নমাত্র নেই। কেবল কফি টেবিল এবং তার আশপাশে পানির সামান্য আভাস, তাও ভাল করে না তাকালে বোঝা যায় না। সেফের দরজা দেখে মনে হয় কোন দানব বুঝি ধারাল কুড়ালের কোপে হিঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ওটা।

ভেতরে একটা ক্যাশ বাক্স এবং একটা ভেলভেট ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। বাক্সটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না প্রেসটন। ব্যাগ বের করে ভেতরের জিনিসগুলো ঢালল কফি টেবিলের ওপর। গ্রেন ডায়মণ্ড। ঝলমল করছে ঘরের আলোয়। যেন নিজের আগুনে জ্বলছে ওরা। সঙ্গে আনা সবকিছু ঝট্‌পট্‌ গুছিয়ে ফেলল প্রেসটন। ইয়ার রিঙ জোড়া ঢুকিয়ে দিল প্যান্টের পকেটে।

কিন্তু সমস্যা হলো টায়রাটা নিয়ে। ওটা এত বড় হতে পারে ভাবেনি প্রেসটন। পকেটে ভরা যাবে না জিনিসটা, বিশ্রিভাবে ফুলে থাকবে পকেট। ওদিকে ফলস্‌ বোতলটাও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে। ওটাও কারও চোখে পড়া চলবে না। পার্টিতে পান করার জন্যে আনা শ্যাম্পেন কেউ

ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। খুঁজেপেতে একটা সুদৃশ্য ব্রিফকেস নিয়ে এল জিম প্রেসটন। খোলাই আছে। ভেতরের জিনিসপত্র কার্পেটের ওপর ফেলে দিল সে কেসটা উপুড় করে।

দু-মিনিট পর হাতে ব্রিফকেস ঝুলিয়ে ফন্টেনয় হাউস ত্যাগ করল জিম প্রেসটন।

নরম তুষার মোড়া চওড়া রাস্তা ধরে তীরবেগে চইকা লিমুজিন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে মেজর কিরলভ। এ মুহূর্তে গাড়িঘোড়া তেমন একটা নেই। আর থাকলেও অসুবিধে ছিল না। কারণ চইকা চলছে রাস্তার মাঝখানের 'ভ্লাস্তি' বা এলিটদের জন্যে রিজার্ভ লেন ধরে। কেবলমাত্র সেন্ট্রাল কমিটির এমওসি নাম্বার প্লেটওয়ালা গাড়িই চলতে পারে ওই লেনে। আশপাশে ট্রাফিকের যত চাপই পড়ুক, এই লেনে পড়ে না কখনও।

মেজরের পাশেই বসেছেন জেনারেল পিওতর মার্চেঙ্কো। সময়মতই নিচে মজুদ ছিল মেজর। জেনারেল উঠে বসতে রওনা হয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশে। তারপর পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, একটা কথাও হয়নি দু'জনের মধ্যে। কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে মেজর? ভাবলেন জেনারেল। বৈঠকের কথা তিনি জানেন, কিন্তু তা কোথায় বসবে জানেন না। চিঠিতেও কিছু লেখেননি প্রেসিডেন্ট। একবার জায়গাটার নাম মেজরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার ইচ্ছে উঁকি দিল মনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলেন মার্চেঙ্কো। দরকার কি? গেলেই তো জানা যাবে।

ছবির মত আলো ঝলমল উক্রেইন হোটেল পিছনে ফেলে উত্তরে চলছে এখন চইকা লিমুজিন। অনুমান করলেন জেনারেল, বোধহয় উসভোয় চলেছে, প্রেসিডেন্টের স্বর্গতুল্য দাচায়। ওখানেই বসবে বৈঠক। কিন্তু

আরও পাঁচ মিনিট পর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আচমকা ডানে বাঁক নিয়ে টোয়েন্টি সিক্স কুটুযভ্স্কি প্রসপেক্টে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

সামনেই সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আশিতলা এক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক। এর অবিশ্বাস্যরকম বড় প্রতিটি ফ্ল্যাটে থাকেন একজন করে পলিটব্যুরোর সদস্য। ভবনটির উঁচু দেয়ালের বাইরে, সামনের পেভমেন্টে গিজগিজ করছে সাদা পোশাক পরা নাইনথ্ ডিরেক্টরেটের গার্ড। এদের সংখ্যা অনুমান করাও মুশকিল। তবে ভেতরে ঢোকার প্রকাণ্ড বিদ্যুৎচালিত গেটে মোতায়েন গার্ডদের পরনে ইউনিফর্ম আছে।

পুরু ধূসর গ্রেটকোট, ইয়ারফ্ল্যাপ নামানো ফারের শাপকা। শাপকার সামনে গাঁথা নীল রঙের ক্রেমলিন গার্ডের প্রতীক। গেটে নিজের পরিচয়পত্র দেখাল মেজর কিরলভ। খুলে গেল গেট। ভবনটির সামনে দাঁড়ানো অসংখ্য গাড়ির ফাঁকে চইকা পার্ক করে নেমে পড়ল মেজর। একটি কথাও না বলে জেনারেলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ভেতরে।

আরও দু'জায়গায় পরিচয়পত্র দেখাতে হলো কিরলভকে। তারপর একজোড়া লুকোনো মেটাল ডিটেক্টর ও একজোড়া এক্স-রে স্ক্যানারের বাধা পেরিয়ে লিফট। চারতলায় নেমে পড়ল মেজর জেনারেলকে নিয়ে। এই ফ্লোরে থাকেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক। হাত বাড়িয়ে ঝকঝকে পালিশ করা পুরু কাঠের দরজায় নক্ করল মেজর কিরলভ।

খুলে গেল দরজা। সাদা পোশাকে আরেক মেজর দাঁড়িয়ে সেখানে। মাথা ঝাঁকিয়ে জেনারেলকে ভেতরে ঢোকার অনুরোধ করল সে। পা বাড়ালেন তিনি। ওদিকে মেজর কিরলভ পিছিয়ে গেল। ঘুরে লিফটের দিকে চলল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এসে জেনারেলকে গ্রেটকোট এবং শাপকার

ভারমুক্ত করল। এরপর বিশাল এক সীটিংরুমে নিয়ে এল তাঁকে সাদা পোশাকধারী মেজর। অস্বাভাবিক উষ্ণ ভেতরটা, অন্তত জেনারেল মার্চেঙ্কোর তাই মনে হলো। তবে বিস্ময়কররকম অনাড়ম্বর। আসবাবপত্র যা আছে সাধারণের চেয়ে সামান্য উঁচু মানের হতে পারে বড়জোর, তার বেশি নয়। সুইডিশ অথবা ফিনিশ সাদা কাঠের তৈরি। বাড়তি বা শোভা বর্ধনের জন্যে অতিরিক্ত কিছুই নেই। যা আছে, ব্যবহৃত হওয়ার জন্যেই আছে।

ব্যতিক্রম শুধু কার্পেট। দেখেই বোঝা যায় দুষ্প্রাপ্য বোখারা কার্পেট। এত পুরু আর চমৎকার ডিজাইনের কার্পেট দ্বিতীয়টি দেখেননি জেনারেল। ঘরের মাঝখানে নিচু একটা কফি টেবিল ঘিরে পাঁচটা চেয়ার সাজানো। তিনজন প্রায় বৃদ্ধ লোক রয়েছেন ঘরে, জেনারেল ঢুকতে ঘুরে তাকালেন সবাই। সব ক'জনকেই চেনেন জিআরইউ প্রধান। তেমনি তাঁরাও চেনেন ওঁকে। সবাই মাথা দুলিয়ে নিঃশব্দে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন জেনারেলের সঙ্গে।

ওদের একজন, মাথা ভরা টাক যাঁর, ভ্লাদিমির ইলিচ পেত্রোফস্কি, মস্কো ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রফেসর। আরও তিনটে পরিচয় আছে ভদ্রলোকের। এক, সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য, দুই, অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সের সদস্য এবং তিন, সেন্ট্রাল কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা।

দ্বিতীয়জন, হালকা পাতলা গড়নের, ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভ, কেজিবির অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক কলাকৌশলের পিছনে মাথা খাটিয়েছেন যিনি জীবনের বেশিরভাগ সময়। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, প্রেসিডেন্টের বাল্যবন্ধু।

এবং তৃতীয়জন, চার মন ওজনের বিশালবপু, ড. জোসেফ পাভলভ।

অ্যাকাডেমিশিয়ান। অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য। ভদ্রলোক দাবার গ্র্যাণ্ড মাস্টারও বটেন। এবং প্রেসিডেন্টের বাল্যবন্ধু। জেনারেল মার্চেঙ্কো জানেন, এই মানুষটির ওপর প্রেসিডেন্ট অনেক ব্যাপারেই নির্ভরশীল। জরুরি কোন পরিস্থিতি দেখা দিলেই পরামর্শ করার জন্যে গ্র্যাণ্ড মাস্টারকে ডেকে পাঠান তিনি। এঁরা এখানে কেন, ভাবছেন জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো।

সীটিংরুমের অন্দরমহলের দিকের দরজার জোড়া পাল্লা খুলে গেল। দু'পাশে শীতল চাউনির দুই প্রকাণ্ডদেহী রোবট সদৃশ বডিগার্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত মানুষটি। পাঁচ ফুট আটের বেশি হবেন না ভদ্রলোক। মাথার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট চকচকে টাক। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। নীল চোখ। নাকটা খাড়া। থুতনিতে খাঁজ। চওড়া, মসৃণ কপাল।

'আপনারা দয়া করে বসুন,' কাছে এসে ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। চেহারা ফ্যাকাসে লাগছে। ভদ্রলোক অসুস্থ, হার্টের রোগি। যত না বয়স, অসুস্থতার কারণে তারচেয়ে অনেক বেশি মনে হয়। এক বছর আগে ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে বুকে পেসমেকার স্থাপন করা হয়েছিল তাঁর। সেই থেকে জনসমক্ষে বলতে গেলে প্রায় বেরই হন না তিনি।

কুটুযভ্স্কি প্রসপেক্টের এক মাইল পশ্চিমে, পঁচিশ একর জুড়ে রয়েছে বার্চের বিশাল এক বনানী। লেনিনের দাচা ছিল ওখানে, সরকারী অবসর যাপন কেন্দ্র। ১৯১৭ সালের পর জীবনের বেশির ভাগ সময় ওখানেই কেটেছে তাঁর। মৃত্যুও হয়েছে লেনিনের ওই দাচায়। স্ট্যালিনের আমলে ওটাকে রূপান্তরিত করা হয় হাইপার এক্সক্লুসিভ সেন্ট্রাল কমিটি হসপিটালে।

বর্তমান বিশ্বের সেরা, সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত হসপিটাল ওটা। তার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ছয়জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসক রোজ দল বেঁধে এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন প্রেসিডেন্টের। সবার ধারণা, তাঁদের ঐকান্তিক এবং একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলেই আজও খাড়া আছেন ভদ্রলোক। আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ওঁরা।

প্রেসিডেন্ট বসতে একে একে অন্যরা বসলেন। জেনারেল মার্চেঙ্কোর আসন পড়েছে ঠিক তাঁর পাশেই। হাসি হাসি মুখে ওঁর দিকেই চেয়ে আছেন তিনি। প্রেসিডেন্টের চোখে পলক পড়ে খুব কম। যখন পড়ে, খুবই ধীরগতিতে পড়ে। ঠিক শিকারী বাজের মত। সময় নষ্ট করলেন না তিনি, কোন রকম ভূমিকার ধারও মাড়ালেন না। 'আমাদের বন্ধু, কমরেড জেনারেল মার্চেঙ্কোর রিপোর্টটি পড়েছেন আপনারা সবাই।'

ওটা কোন প্রশ্ন ছিল না। তবুও সম্মতিসূচক মাথা দোলালেন অন্য তিনজন। ওদিকে জেনারেল বিস্মিত হলেন। এঁদের সবাইকে পড়তে দেয়া হয়েছিল তাঁর রিপোর্ট?

'ওয়েল। আমি তাঁর ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আশা করি আপনাদেরও কারও দ্বিমত নেই। নাকি আছে?'

নেতিবাচক মাথা দোলাল সবাই।

এরপর ঝাড়া এক ঘণ্টা ভাষণ দিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলল সবাই। ভাষণ শেষে মত বিনিময় পর্ব। তারপর চারজনের একটা কমিটি গঠন করা হলো। অ্যালবিয়ন কমিটি। জেনারেল মার্চেঙ্কোর রিপোর্ট বাস্তবায়নের কার্যকর রূপরেখা তৈরি করবে কমিটি। অত্যন্ত গোপনে, মস্কোর বাইরে বসে। রূপরেখার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কাজে কেউ সেক্রেটারির সাহায্য নিতে পারবেন না, যার যার নোট নিজেকেই করতে হবে। পনেরো দিনের মাথায় কমিটি প্রেসিডেন্টের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট করবে ঠিক হলো। এই সময়টা তাদের সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হবে। বাতাসও যেন কিচ্ছুটি টের না পায়।

ব্যাপারটা প্রেসিডেন্ট সাংঘাতিক গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন, ভেবে খুশির অন্ত নেই জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কোর। এ জাতীয় বৈঠক সবসময় নোভাইয়া প্লোশেদের সেন্ট্রাল কমিটি ভবনে হয়ে থাকে। স্ট্যালিনের আমল থেকে তাই হয়ে আসছে। ব্যতিক্রম ঘটল আজই। কারণটা সহজ। তাঁদের একত্র হওয়া, বৈঠক করা ইত্যাদি পলিট ব্যুরোর অন্য সদস্যদের চোখে পড়তে পারে, অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারে তাদের, সে ঝুঁকি নিতে চাননি প্রেসিডেন্ট।

আরেকটা ব্যাপার আছে লক্ষ করার মত। এমন গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে কেজিবিকে যুক্ত করেননি তিনি। যদিও ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের ব্রিটেন সম্পর্কে জ্ঞান বলতে গেলে অগাধ। একজন অবশ্য আছেন কেজিবির, কিন্তু তিনি অবসরপ্রাপ্ত। ওদের না রাখার কারণ যাই হোক, জেনারেল খুশি। বহির্বিশ্বে ঘটতে চলা কোন রুশ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সম্ভবত এই প্রথম কেজিবি অনুপস্থিত।

'কারও কিছু বলার আছে?' প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

নড়ে উঠলেন ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভ, কেজিবির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

'বলুন, ভিক্টর।'

'কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি, আমার শোফার নেই। নিজেই গাড়ি চালাই, কখনও কখনও আমার স্ত্রীও ড্রাইভ করেন সাহায্যের জন্যে। কিন্তু আপাতত তাঁকে দিয়ে কাজ চালাতে চাই না আমি গোপনীয়তার স্বার্থে। একজন বিশ্বস্ত শোফার পেলে উপকৃত হতাম।'

'ঠিক আছে,' একটু চিন্তা করে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনার জন্যে কেজিবির একজন ড্রাইভার নিয়োগের ব্যবস্থা করছি। সকালে রিপোর্ট করবে সে। লোকটা খুবই বিশ্বস্ত। এক সময় আমার অফিশিয়াল শোফার ছিল।'

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

এর মিনিট পাঁচেক পর শেষ হলো বৈঠক।

তিন

অসময়ে নেমেছে ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি। ফলে লম্বা ছুটি কাটিয়ে নতুন করে কর্মোদ্যত লণ্ডন কিছুটা যেন থিতিয়ে পড়েছে। হঠাৎ হঠাৎ বিরতি দেয় বৃষ্টি, ধোঁয়ার মত সাদাটে কুয়াশা ভেসে বেড়ায় বাতাসে। কোথাও ঘন কোথাও হালকা, পর্দার মত। বাতাস তেমন একটা নেই। কাজেই তেমন নড়াচড়া করে না পর্দাটা, স্থির হয়ে ভেসে থাকে। দেখতে দারুণ লাগে মাসুদ রানার।

ভীষণরকম প্রতিকূল আবহাওয়া। বৃষ্টির ফলে ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। হাড়ের ভেতরের মজ্জা পর্যন্ত জমে যাওয়ার জোগাড় কনকনে শীতে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না লণ্ডনবাসীর। হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে নেই কেউ, সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই পথে নেমে এসেছে। পায়ে রেইন বুট, গায়ে বর্ষাতি, মাথায় ছাতা—ব্যস্ত পায়ে যে যার কর্মস্থলের দিকে ছুটছে তারা।

আবহাওয়ার গতিবিধি লক্ষ করার ফুরসত নেই। প্রকৃতির নিয়মে শীত আসবে, বর্ষা আসবে, ওটাই স্বাভাবিক। সেজন্যে কাজ কামাই করতে রাজি নয় এরা। সময়মত খাওয়া-বিশ্রাম যখন চলছে, কাজ চলবে না কোন যুক্তিতে? পাশাপাশি নিজ দেশের চিত্রটা কল্পনা করল মাসুদ রানা। এমন 'বাদল ঘন' দিনে বেশিরভাগ মানুষ ঘর ছেড়ে বেরই হত না। তাস

পিটিয়ে, আড্ডা মেরে, খেয়ে-দেয়ে লম্বা ঢেকুর তুলে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে বিকেলে জেগে উঠে ভাবত, দারুণ কাটল দিনটা।

সুযোগ পেলেই ফাঁকি মারা বাঙালির মজ্জাগত স্বভাব। প্রায় সবার মধ্যেই এ দোষ কিছু না কিছু আছে। যে জন্যে অন্যের দুয়ারে হাত পাতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্ভাগা বাংলাদেশের নিয়তি। বৈদেশিক ঋণের ভারে পিঠ কুঁজো হয়ে যেতে বসেছে, তবু বোধোদয় হয় না বাঙালির। কোনদিন হবে কি না ভবিতব্যও হয়তো নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবে না।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে নিজের ডেস্কে বসল মাসুদ রানা। দু'দিন আগে লণ্ডন এসেছে ও। মনে দ্বিধা আর শঙ্কা ছিল অনেক। এখন তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। একসময় রানা এজেন্সির কার্যক্রমের ওপর বেশ কিছু বিধিনিষেধ ছিল এদেশে। তদন্তে নেমে প্রতি পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হত। যে কাজ দু'দিনে সেরে ফেলা সম্ভব, সেটা শেষ করতে বিশ দিন লাগত। প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়া ছিল এক কথায় অসম্ভব, এমনকি সে তদন্ত সরকারের স্বার্থের অনুকূলে হলেও না।

ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে মাস খানেক আগে কমন্স সভার পরিচিত কয়েকজন সরকারী, কনজারভেটিভ পার্টির প্রভাবশালী সদস্যকে নিজের সমস্যা জানায় মাসুদ রানা। সেই সঙ্গে ইঙ্গিতে এটাও জানিয়ে দেয় যে, এসব বিধিনিষেধ তুলে না নেয়া হলে ব্রিটেনে রানা এজেন্সি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না ওর। এদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় উপকৃত হয়েছে রানার মাধ্যমে। ওর সমস্যা শুনে বিষয়টির সুরাহার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হবে বলে কথা দেয় তারা। কথা রেখেছে তারা সবাই।

কিন্তু বিরোধী লেবার পার্টি দাঁড়িয়ে যায় মাসুদ রানার বিরুদ্ধে। এক কথায় ওর দাবি নাকচ করে দেয় তারা। সঙ্গে গলা মেলায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, এমআই ফাইভ, এমআই সিক্স। একমাত্র বিএসএস এ-লড়াইয়ে রানার

পক্ষ নিয়ে সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ টাগ-অভ-ওয়রের পর রানার দাবি মেনে নিয়েছে সরকার। সবার প্রচণ্ড বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে গতকালই আনুষ্ঠানিকভাবে রানা এজেন্সির ওপর থেকে সব বিধিনিষেধের বেড়াজাল তুলে নেয়া হয়েছে।

ব্রিটেনের আধা সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার সমমর্যাদা লাভ করেছে রানা এজেন্সি। ক্ষমতা সীমাহীন। এবার তার খানিকটা কাজে লাগাবে মাসুদ রানা। লেবার পার্টির অনেক রথী সম্পর্কেই কনফিডেন্সিয়াল ফাইল আছে ওর এজেন্সিতে। তাদের মতিগতি আরও আগে থেকেই জানা আছে ওর। মায় সুইস ব্যাঙ্কে কার কত টাকা দফায় দফায় জমা হয়েছে, কোত্থেকে এসেছে সে টাকা, তা পর্যন্ত।

কিন্তু জেনেও কিছু করতে পারেনি রানা। কারণ বিধিনিষেধ। ওসব নাড়াচাড়া করার মত ক্ষমতা ছিল না। করতে গেলে বরং হিতে বিপরীত হত। আজ আর সে ভয় নেই। এক এক করে ব্যাটাদের মুখোশ খুলে দেবে ও। দেখতে চায় ধাওয়া খেলে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ঘেয়ো কুকুরগুলোর চেহারা কেমন হয়। কি ভেবে হেসে ফেলল রানা। লক্ষই করেনি কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে গিলটি মিয়া।

ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সে রানাকে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে দেখে। ভাবল, এখন থাক, পরে আসা যাবে বরং। ভাবনা-চিন্তার সময় ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। মনস্থির করে ঘুরে দাঁড়াতে গেল গিলটি মিয়া, এই সময় হেসে উঠল রানা। দেখাদেখি তারও দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে হাসল দুজন।

একসময় সচকিত হলো মাসুদ রানা। টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে চোখ পড়ল দরজার ওপর। গম্ভীর হলো ও। 'কি ব্যাপার, গিলটি মিয়া? হাসছ কেন?'

'আপনাকে হাসতে দেকে, স্যার।' অকপট স্বীকারোক্তি গিলটি মিয়ার।

তার মানে বেশ আগেই ঘরে ঢুকেছে ও, ভাবল রানা। 'কখন এলে? টের পাইনি তো!'

'আমার আসা-যাওয়া স্বয়ং উনি পর্যন্ত,' আকাশের দিক নির্দেশ করল গিলটি মিয়া তর্জনী খাড়া করে, 'টের পান না। আর আপনি তো...কতায় বলে, স্যার, তেলচোট্টাও একটা পাকি। বত্রিশ বচোর ধরে...।' রানার ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখে ব্রেক কষল গিলটি মিয়া। মুহূর্তও দেরি না করে অন্য লাইন ধরল। 'চেয়েছিলুম চলে যেতে, স্যার। কিন্তু আপনাকে হাসতে দেকে না ডেঁড়িয়ে পারলুম না। হাসলে আপনাকে কি যে...'

'বলো, কেন এসেছ।'

হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেল গিলটি মিয়ার। আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু পারা গেল না। পকেট থেকে লম্বামত সরু একটা প্যাকেট বের করে ছোট ছোট পায়ে রানার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল। 'লেবারদের সঙ্গে যুদ্যে আপনার জয় হয়েচে। তাই আমার তরপ থেকে এই ছোট্ট উপহার।'

হেসে উঠতে যাচ্ছিল রানা 'লেবারদের' শুনে, কিন্তু দমন করতে সক্ষম হলো শেষ পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে জিনিসটা নিল মাসুদ রানা। 'ধন্যবাদ।' প্যাকেটের ওপর চমৎকার একটা গ্যাস লাইটারের ছবি। 'কেন অনর্থক খরচ করতে গেলে বলো তো?'

গলে পানি হয়ে গেল গিলটি মিয়া। 'বাহ্! অনথক হতে যাবে কেন, স্যার? বিজয়ীকে যে বরমাল্য দিতেই হবে। ওটাই যে রেওয়াজ।'

'তোমার পছন্দ আছে। জিনিসটা দারুণ হয়েছে, গিলটি মিয়া। ধন্যবাদ।'

হাত কচলাতে লাগল গিলটি মিয়া। অনবরত হেঁ-হেঁ করছে। মাসুদ

রানার মুখে একবার ধন্যবাদ পাওয়াই অনেক, প্রায় আশাতীত। তার ওপর আরও একবার পেয়েছে। আনন্দ রাখার জায়গা হচ্ছে না তার ছোট্ট বুকের ভেতর।

সামাল দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করল মাসুদ রানা। মানুষটি সেন্টিমেন্টাল। তাল হারিয়ে কি করে বসে ঠিক নেই। আবার গম্ভীর হলো ও। 'তোমার ট্রেনিং কেমন চলছে, গিলটি মিয়া?'

ওকে আড়াল করে চোখের পানি মুছল সে চট্ করে। কেঁদে ফেলেছে খুশিতে। 'মন্দ নয়, স্যার। ভালই চলচে।'

গিলটি মিয়া বেরিয়ে যেতে আনমনা হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। কেমন মানুষ, বকলে হাসে আর স্নেহ-ভালবাসা পেলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। আগেও অনেকবার ওর চোখে পানি দেখেছে রানা। আসলে গিলটি মিয়া এসবে অভ্যস্ত নয় বলেই ব্যাপারটা ঘটে। জীবনের দীর্ঘ সময় পুলিসের লাথি-গুঁতো খেয়ে, মানুষের ঘৃণা, লাঞ্ছনা পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল মানুষটা। মনের মধ্যে গেড়ে বসেছিল ধারণা, এরই নাম বোধহয় জীবন। এরই নাম বেঁচে থাকা।

যা কখনও পায়নি, মানুষ হিসেবে মর্যাদা, ভাল কাজের স্বীকৃতি, মাসুদ রানার সান্নিধ্যে এসে তাই পেয়েছে সে। হঠাৎ এই পাওয়ায় এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। সে জন্যেই বুঝি সামান্য স্নেহের পরশ পেলে চোখ ভিজে ওঠে লোকটার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যাকেট থেকে লাইটারটা বের করল রানা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর ওটা সিগারেট প্যাকেটের ওপর রেখে পুরানো লাইটারটা ওপরের ড্রয়ারে পুরল। চারটের মধ্যে তিনটে ড্রয়ার ভর্তি ছোটবড় আরও অনেক উপহার সামগ্রী রয়েছে। এজেন্সির 'ফ্রী মুভমেন্টের' লাইসেন্স প্রাপ্তি উপলক্ষে বিএসএস এবং রানা এজেন্সির কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের তরফ থেকে পাওয়া।

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। রিভলভিং চেয়ারের উঁচু পিঠে হেলান দিয়ে ডুবে গেল চিন্তায়। লণ্ডন ত্যাগ করার আগে অবশ্যকরণীয় কি কি, মনের মধ্যে একটা একটা করে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাতে আরম্ভ করল।

'কি, ওস্তাদ,' আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে গিলটি মিয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে জিম। 'কেমন! বলেছিলাম না?'

কথা নেই গিলটি মিয়ার মুখে। সামনের কফি টেবিলে রাখা আছে ডালা খোলা সুদৃশ্য এক ব্রিফকেস। ভেতরে সাজানো গ্রেন ডায়মণ্ডের উজ্জ্বল দ্যুতি দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিয়েছে প্রথম দর্শনেই। শিস্যের এতবড় সাফল্যে খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু কেন যেন হতে পারছে না সে। বসে আছে মুখ গম্ভীর করে।

'কি হলো, ওস্তাদ? মুখ গোমড়া করে আছেন, আপনি খুশি হননি?'

'হয়েচি। শোন্, এ জিনিস কার জানিনে। জানার দরকারও নেই। কিন্তু মন বলচে, এগুনোর সঙ্গে অশুব কিছু একটা রয়েচে। পারলে আজই বিদেয় কর এসব জঞ্জাল। বেচে দে, না হয় নদীতে ফেলে দে, সঙ্গে রাকিসনে। বিপদ হতে পারে তোর।'

'এ কথা কেন বলছেন, ওস্তাদ?' মুখ শুকিয়ে গেল প্রেসটনের। চট করে ব্রিফকেস বন্ধ করে দিল সে।

'ঠিক জানিনে কেন বলচি। তবে নাকে বিপদের গন্ধ পাচ্চি আমি। যা বললাম তাই কর। দেরি করা ঠিক হবে না।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

দুপুর পর্যন্ত বেরোই বেরোই করেও ঘরে বসে থাকল জিম। মন খারাপ হয়ে গেছে। ভেবে রেখেছিল, এমন দামী জিনিস, রয়ে-সয়ে ভাল দামে বিক্রি করবে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কার কথা বলে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়ে

গেল ওস্তাদ। তবে এ-ও ভালই জানে সে, গিলটি মিয়ার মন শুধু শুধু ভয় পায় না। তার পিছনে কারণ থাকে। অতীতে বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছে সে।

ঠিক আছে, যা পাওয়া যায় তাই সই, ভাবল জিম প্রেসটন। তবু ওস্তাদকে অমান্য করবে না। আজই বিদেয় করে দেবে ডায়মণ্ডগুলো। তবে খানিক চিন্তা-ভাবনার পর ব্রিফকেসটার ব্যাপারে অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিল সে। ওটা হাতছাড়া করবে না, রেখে দেবে নিজের কাছে। এত সুন্দর ব্রিফকেস আর চোখে পড়েনি প্রেসটনের। জিনিসটা সে প্রকাশ্যে বের করবে না কখনও। রেখে দেবে গোপনে। কে-ই বা জানবে?

বণ্ড স্ট্রীট। পরিচিত এক জুয়েলারি দোকানের ভেতরে প্রবেশ করল জিম প্রেসটন। দোকানটা ছোট। তবে এদের হাতের কাজের সুনাম আছে খুব। গাঢ় রঙের স্যুট পরেছে আজ প্রেসটন। সিল্কের শার্ট, মিউটেড টাই। হাতে সাধারণ একটা অ্যাটাশে কেস।

খুদে কাউন্টারের ওপাশে বসা সুন্দরী অভ্যর্থনাকারিণী মুখ তুলে মধুর হাসি দিল এক চিলতে। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে, স্যার?'

'কিরলনস্কির সাথে দেখা করতে চাই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। 'বলুন, জেমস দেখা করবে।' এ দোকানের মালিক লোকটা।

মেয়েটি নড়ার আগেই দোকানের পিছনদিকের টিনটেড গ্লাসের দরজাটা খুলে গেল। খাটো, ভীষণ মোটা এক টাক-মাথা দাঁড়িয়ে ওখানে। জিমের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। 'মিস্টার জেমস! কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন,' বলে মেয়েটির দিকে তাকাল। 'আমার বন্ধু, বুঝলে? অনেকদিন পর দেখা।'

মাথা দুলিয়ে আরেক চিলতে হাসি দিল মেয়েটি। সামান্য পিছিয়ে গিয়ে

প্রেসটনকে ভেতরে ঢোকার জায়গা দিল লুইস কিরলনস্কি। কাঁচের দরজা বন্ধ করে নিজের ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। কেবল ডেস্কের ওপর একটা শেড পরানো বাতি জ্বলছে, গোল আলোটা পড়েছে টেবিলের মাঝখানে বিছানো সাদা একখণ্ড ব্লটারের ওপর। প্রেসটনকে পাশের একটা চেয়ার ইঙ্গিত করে নিজের আসনে বসল মোটা। 'তারপর, জেমস? ইন্টারেস্টিং কিছু?'

'আমি সব সময় ইন্টারেস্টিং জিনিসই এনে থাকি। কেবল তুমিই ওতে ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে পাও না।' কেসটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো বের করে ব্লটারের ওপর রাখল জিম প্রেসটন।

'আরে না! আমি কি সত্যি সত্যি···।' সামনের ঝলমলে পাথরগুলোর ওপর চোখ পড়তে ভাষা হারিয়ে ফেলল লুইস কিরলনস্কি। দম বন্ধ হয়ে এল তার। অবিশ্বাসে চোখ উঠে গেছে কপালে। 'গ্লেন···' দম নিল সে। 'তুমি গ্লেন ডায়মণ্ড···?'

হাসল জিম প্রেসটন। 'কি মনে হয়, ইন্টারেস্টিং?'

'ও-ও মাই গড্!' টাকে হাত বোলাতে লাগল কিরলনস্কি। ঝাড়া দশ মিনিট বসে থাকল সে বাক্‌হারা হয়ে। প্রেসটন যেমন এগুলোর ইতিহাস জানে, তেমনি সে-ও জানে। সোজা পথে কিরলনস্কি যত অর্থ কামিয়েছে, তার হাজার গুণ বেশি কামিয়েছে বাঁকা পথে। এগুলোর ওপর নজর ছিল তারও। কিন্তু থাকলে কি হবে? সে-তো আর জিম প্রেসটন্ নয়।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টেকো। 'ইউ, নটি বয়। ট্যালেন্টেড নটি বয়,' মন্তব্যটা দ্রুত যেন সংশোধন করল। পোলিশ অ্যাকসেন্টে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে কিরলনস্কি। কারণ সে পোল, ইহুদি।

১৯৩৯ সালে নাজি বাহিনীর পোল্যাণ্ড আগ্রাসনের সময় বন্দী হয় লুইস জিরলনস্কি। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত জার্মানদের হাতে আটক ছিল

সে। পরে মিত্রবাহিনী অসউইজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে অন্যদের সঙ্গে তাকেও মুক্তি দেয়। সে বছরই ইংল্যাণ্ড চলে আসে কিরলনস্কি। প্রথমে কয়েক বছর এক জুয়েলারি দোকানে চাকরি করে। তারপর নিজেই একদিন দোকান দিয়ে বসে।

এতগুলো বছর এ দেশে কাটিয়েও ইংরেজিটা ভালমত রপ্ত করতে পারেনি লুইস কিরলনস্কি। অবশ্য শেখার তেমন চেষ্টাও ছিল না তার। প্রচুর টাকার মালিক মানুষটি। সংসারে মেয়ের বয়সী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই তার। মেয়েটি এদেশী, এক সময় জিম প্রেসটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তার। একটি গুণ আছে লুইস কিরলনস্কির, জীবনে কখনও কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি। অন্যদের তুলনায় পয়সা কিছু কম দেয় সে, কিন্তু তবুও এখানেই বারবার আসে প্রেসটন তার ওই গুণটির জন্যে। জান চলে গেলেও একটি গোপন তথ্যও কেউ বের করতে পারবে না লুইসের পেট থেকে।

'কী এত ভাবছ?'

'ভাবছি অনেক কিছুই, বয়। এগুলো কোন সাধারণ পাথর নয় যে…। কি যে করি!'

'রাস্তা যা হোক কিছু একটা বের করো।'

'এগুলোর দাম কত হতে পারে অনুমান করতে পারো?'

'অনেক। এক মিলিয়ন পাউণ্ডের কম তো নয়-ই।'

'বোঝো তাহলে ঠ্যালা। এর জন্যে এমন এক ক্রেতা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে, যে জনসমক্ষে এগুলো বের না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিনতে রাজি হবে। এমন ক্রেতারও অভাব নেই। আছে, তবে খুব কম। তাদের কাছে এর ন্যায্য দামও আশা করতে পারো না তুমি। যা চাইব, নির্ঘাত তার অর্ধেক দাম বলবে।'

ভাগ্যিস, ব্যাটা আরও কমিয়ে বলেনি, ভাবল জিম প্রেসটন। 'কতদিন

অপেক্ষা করতে হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল লুইস কিরলনস্কি। 'তার কি কোন ঠিক আছে? কাল-পরশুও পেয়ে যেতে পারি যদি ভাগ্য ভাল হয়। আবার দু'চার বছরও লেগে যেতে পারে।'

'মুসিবত!'

'আরেকটা উপায় আছে তাড়াতাড়ি বিক্রি করার।'

'কি?'

'সেটিং ভেঙে সোনা আর ডায়মণ্ড আলাদা আলাদাভাবে বিক্রি করে দেয়া। তাতে দাম অবশ্য অনেক কমে যাবে।'

'আমাকে কত দিতে পারবে তাই বলো,' একটা সিগারেট ধরাল জিম প্রেসটন।

খানিক হিসেব কষল লুইস কিরলনস্কি। টাক চুলকাল। 'খাটনি অনেক, সময়ও লাগবে প্রচুর···সে যাক্। তোমাকে পুরো বিশ হাজার দেব আমি। তবে এখনই সব দিতে পারব না। অর্ধেক আজ, নগদ। বাকিটা এগুলো বিক্রি করে।'

আরও মিনিট পাঁচেক কথা হলো দুজনের। তারপর নগদ দশ হাজার পাউণ্ড পকেটে পুরে আসন ছাড়ল প্রেসটন। সেদিন এবং তার পরদিন পিছনের রূমের দরজা বন্ধ করে কাজ করল লুইস কিরলনস্কি এক মনে। কাজ শেষ করে বেরিয়ে এসে এক পাবলিক ফোন বুদ থেকে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্পে টেলিফোন করল।

এরপর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ভোরের প্রথম ব্রাসেলস্ ফ্লাইটের একটা আসন বুক করল সে নিজের জন্যে। দিনের আলো পুরোপুরি ফোটার আগেই হিথ্রো এয়ারপোর্টের লণ্ডন-ব্রাসেলস ডেইলি প্যাসেঞ্জার ব্যবসায়ীদের জটলা থেকে সামান্য তফাতে, সোফায় বসা দেখা গেল

কিরলনস্কিকে। আনমনা। পরনে ভারি ওভারকোট, মাথায় নরম টুইডের হ্যাট। হাতে হ্যাণ্ডগ্রিপ, মুখে বড়সড় একটা ব্রায়ার পাইপ।

কিন্তু পাইপ টানছে না লুইস। তামাক ওতে আছে ঠিকই, তবে তামাকের তলায় অন্য জিনিসও আছে। চেপেচুপে বসানো আছে চার চারটে গ্রেন ডায়মণ্ড। বিমানে আসন নিতেই হাসিমুখে এক হোস্টেস এগিয়ে এল লুইস কিরলনস্কির দিকে। মুখ নামিয়ে যথেষ্ট নম্রতার সঙ্গে বলল, 'পাইপটা দয়া করে পকেটে রাখুন, স্যার, প্লীজ। কেবিনে ধূমপান নিষেধ।'

'নিশ্চই নিশ্চই।' পাইপটা পকেটে রাখার সুযোগ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিরলনস্কি। ব্রাসেলস নেমে ট্যাক্সি চেপে উত্তরে ছুটল সে। মোটরওয়ে ধরে প্রথমে মিসিলেন, তারপর ডানে বাঁক নিয়ে উত্তরপুবের লিয়ের এবং নিয়েলেনের উদ্দেশে। বেলজিয়ামের পৃথিবী বিখ্যাত ডায়মণ্ড ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয় অ্যান্টওয়ার্পের পেলিকানস্ট্রাট এবং তার আশেপাশে।

বিশাল সব ডায়মণ্ড এন্টারপ্রাইজের শো-রুম এবং কারখানা আছে এখানে। দৈনিক কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা হয়। সারা দেশে এদের হাজারো সরবরাহকারী আছে। এমনই এক সরবরাহকারী রাউল লেভি। সে-ও পোলিস, এবং ইহুদি। লুইসের মত লেভিও বিশ্বযুদ্ধের পরে এদেশে এসে ব্যবসা শুরু করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে দুজনের। নিয়েলেন গ্রামে থাকে সে।

লাঞ্চের সামান্য আগে বৈঠকে বসল লুইস কিরলনস্কি ও রাউল লেভি। এক ঘণ্টা আলোচনা, দর কষাকষির পর পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে গ্রেন ডায়মণ্ডগুলো কিনে নিতে সম্মত করানো গেল লেভিকে। অর্ধেক টাকা এখন, বাকিটা বিক্রির পর পরিশোধের শর্তে। টাকা নিয়ে ওইদিনই লণ্ডন ফিরে এল কিরলনস্কি।

জানুয়ারির ছয় তারিখ, মাঝরাতের সামান্য আগে লণ্ডন ফিরে এলেন রবার্ট

ফিলবি। একা। স্ত্রী রয়ে গেছেন ভাইয়ের ওখানে, কিছুদিন বেড়িয়ে ফিরবেন। টানা ছয় ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত ফিলবি। ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী। স্লিম ফিগার। বয়স পঞ্চান্ন। দুই কানের ওপরে চুল বেশিরভাগই পাকা। অভিজাত চেহারা।

সোজা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে ঢুকে পড়লেন রবার্ট ফিলবি। গাড়ি লক্ করে স্যুটকেস নিয়ে উঠে এলেন নিজের ফ্লোরে। মন-মেজাজ ভাল নেই। স্ত্রীর এ-সময় গ্রামের বাড়িতে থেকে যাওয়া পছন্দ হয়নি তাঁর। কারণ ফেডোরার এই 'কিছুদিন' প্রায়-সময়ই মাস ছাড়িয়ে যায়। এবার কতদিন লাগবে কে জানে। তালা খুলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর পা রাখলেন রবার্ট ফিলবি।

দাঁড়িয়ে গেলেন চট্ করে। কুঁচকে উঠেছে কপাল। অ্যালার্ম সিস্টেম থেকে 'পিপ্' 'পিপ্' সঙ্কেত বেজে ওঠার কথা। কিন্তু উঠল না। কেন? যাওয়ার সময় তো তিনি নিজ হাতেই মাস্টার সুইচ অন্ করে দিয়ে গিয়েছিলেন অ্যালার্মের। নষ্ট হয়ে গেল নাকি সিস্টেম? বিরক্ত মুখে ক্লোক রুমে ঢুকলেন ফিলবি। অফ করে দিলেন ওটার মাস্টার সুইচ। তারপর স্যুটকেস রেখে সীটিংরুমে এলেন। বাঁ-হাতে টাইয়ের নট্ আলগা করতে করতে আলোর সুইচ টিপলেন।

এবং জায়গায় জমে গেলেন সামনের দৃশ্য দেখে। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল চোয়াল। দেহের পাশে ঝুলে পড়ল বাঁ হাত। সামনের দেয়াল এবং সেফটার অবস্থা দেখে মাথা ঘুরে উঠল। ধাতস্থ হতে এক মিনিট লাগল। লম্বা পায়ে ঘর অতিক্রম করে সেফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন রবার্ট ফিলবি। উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখলেন। তারপর পায়ের কাছে পড়ে থাকা একরাশ কাগজপত্র, কলম, নোটবই ইত্যাদির দিকে তাকালেন।

অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'ওহ্, গড! আমার ব্রিফকেস!'

পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ফিলবি ধপ্ করে। শ্বাস বইছে ঝড়ের বেগে। গালে হাত দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছেন। মুখের রক্ত সরে গিয়ে চেহারা হয়ে উঠেছে কাগজের মত। দশ মিনিট পর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন রবার্ট ফিলবি। রুমের এক কোণে স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নাম্বার টিপতে লাগলেন।

রিঙের পর রিঙ হচ্ছে ও-প্রান্তে, কিন্তু ধরছে না কেউ।

একটানা তিন দিন প্রচেষ্টা চালানোর পর ও-প্রান্তের সাড়া পেতে সমর্থ হলেন রবার্ট ফিলবি, ওয়েস্ট এণ্ডের এক নামী-দামী হোটেলের অ্যালকোভে সেদিনই সন্ধেয় লোকটির মুখোমুখি হলেন তিনি। তার আগের দিন রাতে অ্যান্টওয়ার্প থেকে ঘুরে এসেছে লুইস কিরলনস্কি।

বয়স ষাটের মত হবে লোকটির। আয়রন গ্রে চুল। হালকা খয়েরি চোখজোড়া অস্থির, কি যেন খুঁজে ফিরছে সারাক্ষণ। পোশাক-আশাক মূল্যবান, সুন্দর ছাঁটের। গোবেচারা ভাব, তবে দেখার চোখ দিয়ে দেখলে মানুষটি যে সাধারণ আর দশজনের মত নয়, 'অসাধারণ', সহজেই বোঝা যায়। আইনের দেয়ালের ওপাশে বসবাস তার।

'দুঃখিত। তিনদিন বাইরে ছিলাম। আপনার অসুবিধের জন্যে...বোঝেনই তো। ব্যাচেলর মানুষ। বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে যেতেই হলো। এবার বলুন কেন খুঁজছেন আমাকে।'

অল্প কথায় ব্যাপারটা তাকে খুলে জানালেন রবার্ট ফিলবি। শুনতে শুনতে দৃষ্টি আরও চঞ্চল হয়ে উঠল লোকটির। 'পুলিসকে জানিয়েছেন?'

'না,' দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন ফিলবি। 'ভাবলাম, আগে আপনাকে জানাই। তারপর অবস্থা বুঝে যা করার করব।'

'এখন আর চাইলেও ওদের জানাতে পারছেন না আপনি,' কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল অসাধারণ। 'দেরি হয়ে গেছে। তাতে উল্টো বিপদ হবে। আপনি নিজেই ফেঁসে যেতে পারেন। অবশ্য... ।'

'কি?'

'যদি এমন করা যায়, সেফ পাল্টে সব আগের মত...না, সম্ভব নয়। এ ক'দিন নিশ্চই শেফিল্ডে ছিলেন না আপনি। ছিলেন এখানেই। বাইরের কেউ না দেখে থাকলেও অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কেউ না কেউ দেখেছে আপনাকে। কাজেই ওসব করতে গেলে কেঁচে যাবে।'

'ঠিক।'

'আপনার স্ত্রী ক'দিন থাকবেন ভাইয়ের ওখানে?'

'ঠিক জানি না। তবে দুই এক সপ্তা তো বটেই।'

'গুড। এর ভেতর একই মডেলের আরেকটা সেফ বসাতে হবে আগের জায়গায়। যে করে হোক, নকল গ্রেন ডায়মণ্ড জোগাড় করতে হবে। সময় লাগবে। ধৈর্য ধরে কাজটা সারতে হবে। নইলে আপনার স্ত্রী ফিরে যদি দেখেন তাঁর সখের অলঙ্কার চুরি হয়েছে, তাহলেই হয়েছে। ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেয়া যাবে না তাঁকে ব্যাপারটা।'

'সে না হয় হলো, কিন্তু আসলগুলো উদ্ধারের কি ব্যবস্থা করা যায়?'

'আমার ওপর ছেড়ে দিন সে ভার। আজই খোঁজ-খবর শুরু করছি আমি। আমার ধারণা, অনেক আগেই লণ্ডনের বাইরে চলে গেছে ডায়মণ্ডগুলো। হয়তো এতক্ষণে কেটেকুটে অন্যরকম আকার দেয়া হয়েছে। চেনা সহজ হবে না। সে আমি বুঝব। আপনাকে যা বললাম, তাই করুন। সেফটা পাল্টান। ঘর, অ্যালার্ম সিস্টেম মেরামত করে ফেলুন। আর আপনার স্ত্রী যতদিন সম্ভব ভাইয়ের ওখানেই যেন থাকেন সে ব্যবস্থা করুন।

সবার সঙ্গে পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে হবে। বাকি সব সামলাব আমি। আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না। সময় হলে আমিই যোগাযোগ করব।'

আসন ত্যাগ করল লোকটা। কোনদিকে না তাকিয়ে ছোট ছোট পায়ে বেরিয়ে গেল হোটেল ছেড়ে। বসে থাকলেন রবার্ট ফিলবি। চিন্তিত। সেই সঙ্গে আতঙ্কিত। পারবে তো লোকটা?

চার

দুটো গাড়িতে এল ওরা চারজন। গাট্টাগোট্টা, বিশালদেহী সবাই। ভীতিকররকম হিংস্র চেহারা। মলেনস্ট্রাটে রাউল লেভির বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল দুই আরোহীসহ একটা কালো সেডান। অন্য দুজনকে নিয়ে আরেকটা সেডান দাঁড়াল শ' খানেক গজ এগিয়ে। দুটো গাড়ির প্যাসেঞ্জার সীটে বসা দুজন নেমে পড়ল। ড্রাইভার দুজন নামল না। আলো নিভিয়ে বসে থাকল চুপচাপ এঞ্জিন চালু রেখে।

সন্ধে সাতটা। প্রচণ্ড শীত পড়েছে আজ। মানুষজনের কোন চিহ্নই নেই রাস্তায়। আরোহী দুজন লেভির বাংলোর ফ্রন্ট ডোরে এসে নক্ করল। লেভি স্বয়ং খুলল দরজা। পাথরমুখো দুই বিশালদেহী ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। প্রতিবাদ জানাবার জন্যে মুখ খুলতে গেল রাউল লেভি, কিন্তু সোলার প্লেক্সাসে ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ খেয়ে স্বর আটকে গেল গলার কাছে।

চিত হয়ে পড়েই যাচ্ছিল সে আরেকটু হলে।

কলার চেপে ধরে ঠেকাল অন্যজন। দরজার কাছের একটা স্ট্যাণ্ডে ঝুলছে লেভির ওভারকোট, ওটা তার কাঁধের দুদিকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। তারপর দুজন দু'পাশ থেকে ধরে বাংলো থেকে বের করে নিয়ে এল তাকে। ব্যথায় এখনও চোখে আঁধার দেখছে রাউল লেভি। বাধা দেয়ার মত শক্তি বা ক্ষমতা কোনটাই নেই। ঘোরের মধ্যে হাঁটছে সে আগন্তুকদের সঙ্গে।

বাংলোর গেটে অপেক্ষমাণ সেডানের পিছনের দরজা মেলে ধরেছে ড্রাইভার ওদের এগিয়ে আসতে দেখে। ভেতরে ঠেলে ঢোকানো হলো রাউল লেভিকে। দু'পাশে বসল দুই বিশালদেহী। অবাক ব্যাপার, এতক্ষণে লোকগুলোর মুখ থেকে একটা শব্দও বের হতে শোনেনি লেভি। যেন কথা বলতে জানে না কেউ, বোবা। রওনা হয়ে গেল সেডান।

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পঞ্চাশ একর জোড়া বিশাল পাবলিক পার্ক কেসেলসি হেইডের ঠিক মাঝখানে এসে থামল গাড়ি দুটো। দ্বিতীয় গাড়ির একমাত্র আরোহী-কাম-চালক বেরিয়ে এসে প্রথমটির চালকের পাশের সীটে বসল। সে-ই দলনেতা। পিছন ফিরে সঙ্গীদের কিছু একটা ইঙ্গিত করল সে। এবার রাউল লেভির ডানদিকে বসা লোকটি দু'হাতে শক্ত করে ঠেসে ধরল তাকে। যাতে নড়াচড়া করতে না পারে লেভি।

বাঁ পাশের জন পকেট থেকে বের করল ভারি একজোড়া প্লায়ার্স। অত্যন্ত ধীর স্থির ভঙ্গিতে লেভির বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে পর পর তিনটে আঙুলের গাঁট গুঁড়ো করে ফেলল সে প্লায়ার্সের প্রচণ্ড চাপে। চিৎকার করতে পারছে না রাউল, কারণ ঘুরে বসে তার মুখ চেপে ধরে রেখেছে ড্রাইভার। সীটের নরম গদিতে প্রায় সেঁধিয়ে গেছে তার মাথার অর্ধেকটা।

মাথা ঝাঁকাল দলনেতা। 'কথা বলতে চাও?'

বুকের ভেতর ঘড় ঘড় করছে রাউল লেভির। মুখ চেপে ধরে রাখার ফলে

বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না আর্ত গোঙানি। দ্রুত মাথা দোলাল সে, বলতে চায়।

মুখ চেপে ধরা হাতটা সরে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় নেতিয়ে পড়ল লেভি। দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ফোঁপাল সে, গোঙাল। বাধা দিল না কেউ। মূর্তির মত বসে থাকল চার বিশালদেহী। আরও পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো তাকে কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার। তারপর মুখ খুলল দলনেতা। 'লণ্ডন থেকে চুরি যাওয়া ডায়মণ্ড। কোথায় আছে ওগুলো?'

পোলিস অ্যাকসেন্টের ফ্লেমিশ ভাষায় গড়গড় করে বলে গেল রাউল লেভি। দেরি করল না এক মুহূর্তও।

মাথা দোলাল দলনেতা সন্তুষ্ট হয়ে। 'সেফের চাবি?'

লেভির পকেটেই ছিল চাবি। গোছাটা নিয়ে দ্বিতীয় সেডান চালিয়ে তার বাংলোয় ফিরে চলল লোকটা। ডায়মণ্ডগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পার্কের গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল গাড়িটা। ভাঙা আঙুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরে অনবরত গোঙাতে লাগল রাউল লেভি। পাশের লোক দুটো একবার তাকালও না তার দিকে। যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ড্রাইভারও তেমনি। সোজা সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। স্টিয়ারিঙ হুইলে তবলা বাজাচ্ছে গ্লাভস পরা আঙুল দিয়ে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিরে এল দলনেতা। নিজের গাড়ি ছেড়ে এটায় এসে উঠল। 'শেষ একটা প্রশ্ন। এগুলো কে দিয়ে গেছে তোমাকে, কি নাম তার।'

মাথা দোলাল লেভি। বলবে না। কিন্তু বলতে বাধ্য করা হলো তাকে। ভাল হাতের আরও দুটো আঙুল খোয়াবার পর মুখ খুলল সে। বলে দিল লুইস কিরলনস্কির নাম। নিঃশব্দে পার্ক ত্যাগ করল গাড়ি দুটো। একটায় রাউল লেভিসহ তিনজন। অন্যটায় দলনেতা একা। টানা বিশ মিনিট পর

নিয়েলেনের দু'মাইল পুবে লূই স্ট্রাট ক্রসিঙে পৌঁছল তারা। সামনেই লিয়ের-হেরেন্টাল রেল লাইন, তীরের মত সোজা চলে গেছে।

রেল লাইনের দুই পারে ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা খামারবাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। জনমানবের কোন সাড়া নেই কোথাও। রেল ক্রসিঙের সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ল সেডান দুটো। আলো নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দেয়া হলো। প্রথম গাড়ির চালক বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে ঘরে তৈরি বিশেষ এক ধরনের মদ ভরা বোতল তুলে দিল লেভির ডানপাশের সঙ্গীর হাতে।

জোর করে বোতলের সবটুকু গেলানো হলো রাউল লেভিকে। তারপর চুপ করে বসে থাকল সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেল লেভি। ঢুলছে মৃদু মৃদু। তার বরং ভালই লাগছে। অ্যালকোহলের প্রভাবে হাতের ব্যথা এখন আর খুব একটা টের পাচ্ছে না। এগারোটা পনেরোয় গাড়ি থেকে ধরাধরি করে বের করা হলো তাকে।

রেল গাড়ির আওয়াজ আসছে। এগারোটায় লিয়ের থেকে ছাড়া মালবাহী ডিজেল-ইলেক্ট্রিক নন স্টপ লোকো আসছে। সাধারণত সত্তর মাইল বেগে এই ক্রসিং অতিক্রম করে ওটা। রাউল লেভি তখন প্রায় অজ্ঞান। দেহটা রেলের ওপর শুইয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেল লোকগুলো। অপেক্ষা করতে লাগল শেষটুকু দেখার জন্যে।

একেবারে অন্তিম মুহূর্তে নিথর পড়ে থাকা দেহটার ওপর চোখ পড়ল লোকো চালকের। পলকে ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে গেল সে। রেল আর হুইলের প্রচণ্ড ঘর্ষণে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। আতশবাজির ফুল্‌কির মত স্ফুলিঙ্গের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। গতি অনেকটা মন্থর হয়ে পড়ল মালগাড়ির। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

কম করেও ত্রিশ মাইল গতিতে রাউল লেভির দেহটা দ্বিখণ্ডিত করে

দিয়ে গেল নিয়ের-হেরেন্টাল লোকো। লাইনের ওপর চাকা ঘষে ঘষে আরও এক-দেড়শো গজ এগিয়ে থামল দীর্ঘ গাড়িটা। লাফিয়ে নামল চালক টর্চলাইট নিয়ে। কাছে এসে এক পলক দেখল সে রক্ত মাংসের খণ্ড দুটো। তারপর কাছের খামারবাড়ির দিকে ছুটল পুলিসে টেলিফোন করতে।

তার আগেই নিজেদের গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে গেছে কালো সেডান দুটো।

লোকগুলোকে দেখামাত্রই চিনে ফেলল লুইস কিরলনস্কি। চেহারাতেই ফুটে আছে তাদের প্রকৃতি। বাসায় লুইস একা, স্ত্রী মেলিণ্ডা গেছে শপিঙে। টিভিতে খবর দেখছিল সে। রোজই আশা করে, আজ হয়তো গ্লেন ডায়মণ্ড চুরি হওয়ার খবর বলবে টিভি। কিন্তু পাঁচ দিন পেরিয়ে গেল, এখনও কোন খবর নেই। ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। এমন গরম খবর কি করে গোপন থাকে?

করাঘাতের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দিল সে। ভেবেছে বুঝি মেলিণ্ডা। পরমুহূর্তে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল লোক তিনটে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। ইস্ট এণ্ডের মাস্‌ল্‌ম্যান এরা। আণ্ডারওয়ার্ল্ডে 'স্ল্যাগ' নামে পরিচিত। এদের দুটোকে বোধবুদ্ধিহীন রোবট বলে মনে হলো কিরলনস্কির। হুকুম পেলে করতে পারে না এমন কাজ নেই।

অন্যজন, মাথায় নোংরা সোনালি চুল। ছুঁচোর মত চেহারা। পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। দলনেতা। এই চেহারা এবং প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে অনেক আগেই পরিচয় হয়েছে লুইস কিরলনস্কির। অসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। তাদের অবশ্য ইউনিফর্ম ছিল পরনে। কাজেই বাধা দেয়ার কোন চেষ্টাই করল না সে। জানে বাধা দিয়ে বা দয়া ভিক্ষা করে কোন লাভ নেই। ওরা যা করতে এসেছে তা করবেই।

ঠেলতে ঠেলতে সীটিংরুমে নিয়ে এল তারা কিরলনস্কিকে। ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিল একটা আর্মচেয়ারে। পিছনে গিয়ে দাঁড়াল একজন, লুইসের দু'হাত টেনে নিয়ে গেল পিছনে, ধরে থাকল শক্ত করে। আরেকজন সামনে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ বিশাল ডান হাতে 'চটাশ্' 'চটাশ্' ঘুসি মারছে বাঁ হাতের তালুতে। একটা টুল নিয়ে এসে লুইস কিরলনস্কির মুখোমুখি সামান্য ডানদিকে সরে বসল দলনেতা।

'মারো!' হুকুম দিল সে।

লুইসের নাকমুখ লক্ষ্য করে ভয়ঙ্কর শক্তিতে ঘুসি মেরে বসল সামনেরজন। তামার তৈরি পাঞ্জা পরে নিয়েছে সে কখন যেন, খেয়াল করেনি কিরলনস্কি। চোখের পলকে চেহারা পাল্টে গেল তার। সামনের দিকের উভয় পাটির দাঁত মাড়ি সব ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। ঠোঁট হাঁ হয়ে গেল কেটে। থুতনি বেয়ে দরদর করে গড়িয়ে নামতে লাগল তাজা রক্ত। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে পিছনে হেলে গেল মাথাটা তার বেকায়দা ভঙ্গিতে।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল ছুঁচো। 'ওখানে নয়, হাঁদা! ওকে দিয়ে কথা বলাতে হবে জানো না? নিচে মারো।'

এবার লুইসের বুকের দু পাশে রিবের ওপর সর্বশক্তি দিয়ে পর পর দুটো ঘুসি চালাল লোকটা। ভেতরের হাড় ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল পরিষ্কার। ভাঙা গলায় প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল কিরলনস্কি। আবার হেসে উঠল দলনেতা। ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে সে। এ জাতীয় দৃশ্য সব সময়ই আনন্দ দেয় তাকে।

গায়ের সবটুকু জোর এক করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল কিরলনস্কি। কিন্তু পিছনের হাত দুটো যেন লোহায় গড়া, নড়ানো গেল না একচুলও। এই সময় কথা বলে উঠল দলনেতা। 'তুমি মানুষটা ভাল নয়, লুইস। আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে খেপিয়ে তুলেছ তুমি। কার কাছ থেকে

পেয়েছ জিনিসগুলো?'

কুলি করে মুখ ভর্তি রক্ত আর গোটা চারেক দাঁত ফেলল লুইস। উত্তর দিল না।

'বলে ফেলো কার কাছ থেকে পেয়েছ জিনিসগুলো। যত তাড়াতাড়ি বলবে ততই তোমার মঙ্গল। তার আগে শুনে রাখো, রাউল লেভির খোঁজ পেয়ে গেছি আমরা।'

চোখ বুজল লুইস কিরলনস্কি। মুখ খোলার লক্ষণ নেই কোন।

রেগেমেগে পাঞ্জা পরা সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল ছুঁচোমুখো। আবার শুরু হলো ঘুসি বৃষ্টি। যতক্ষণ না নামটা উচ্চারণ করল সে, ততক্ষণ চলল নির্দয় মার। নামটা শোনামাত্র হাত তুলে আঘাতকারীকে থামতে বলল নেতা। পিছনেরজন হাত ছেড়ে দিল লুইসের। গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল মৃতপ্রায় জুয়েলার। দম নিচ্ছে ছোট ছোট। নীল হয়ে গেছে ঠোঁটের চার পাশ।

'হার্ট অ্যাটাক করেছে ব্যাটার,' বলল একজন। 'মরল বলে।'

'চলো, কেটে পড়ি।'

দ্রুত বেরিয়ে এল দলটা। দূরে রেখে আসা পুরানো একটা ভ্যানের দিকে চলল জোর পায়ে। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল মেলিণ্ডা। দু হাতে গোটা পাঁচেক ঢাউস শপিঙ ব্যাগ নিয়ে নিজের দামী মেট্রো থেকে বেরিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়াল। বাংলোর সামনের দরজা খোলা দেখে বেশ অবাক হলো সে।

দু' মিনিট পর ব্যস্ত হাতে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে দেখা গেল মেলিণ্ডাকে। কাঁদছে ঝর ঝর করে। ছয় মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল অ্যাম্বুলেন্স, রয়্যাল ফ্রী হাসপাতালের দিকে ছুটল মৃতপ্রায় লুইস কিরলনস্কিকে নিয়ে। তার এক হাত ধরে পাশে বসে থাকল মেলিণ্ডা। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসতে হঠাৎ করেই চোখ খুলল লুইস।

আঙুলের ইশারায় তার মুখের সামনে কান পাততে বলল সে স্ত্রীকে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে বসল মেলিণ্ডা। প্রাণান্তকর চেষ্টায় ফিস্ ফিস্ করে দু'চারটে শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো কিরলনস্কি। শুনে কপাল কুঁচকে উঠল মেলিণ্ডার। হতভম্ব হয়ে গেছে। অ্যাম্বুলেন্স হ্যাম্পস্টেড পৌছার আগেই মারা গেল লুইস কিরলনস্কি।

হাসপাতালের 'ডেড অন অ্যারাইভেল' রেজিস্টারে নাম উঠল তার। লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যবচ্ছেদের জন্যে। এর কয়েক মিনিট পর টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল জিম প্রেসটনের। ফোন ধরে আহাম্মক হয়ে গেল সে। ওপাশে একটি নারীকণ্ঠ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কথা বলতে পারছে না। অনেকক্ষণ লাগল মেলিণ্ডার নিজেকে সামলাতে। রয়্যাল ফ্রীর ক্যাজুয়ালটি অ্যাডমিশন থেকে ফোন করেছে সে।

তার বক্তব্য মন দিয়ে শুনল জিম প্রেসটন। ঘুমের রেশমাত্র অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে। 'ঠিক আছে, মেলিণ্ডা। অনেক ধন্যবাদ। আর...লুইসের জন্যে আমি খুব দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। ঝামেলা মিটিয়ে তোমার ওখানে আসছি আমি, কেমন? রাখলাম।'

রিসিভার রেখে কয়েক মুহূর্ত ভাবল প্রেসটন। তারপর বিরতি না দিয়ে দু জায়গায় দু'টো ফোন করল। তার মেশিন ওয়ার্কশপের দুই কর্মচারী, স্মিথ ও টাশকে। দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছল প্রেসটনের ওখানে। নির্দেশমত যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে। এর ঠিক ত্রিশ মিনিট পর নক্ হলো দরজায়।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রেসটন। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে শেষবারের মত দেখে নিল সঙ্গীদের অবস্থান। বুক ভরে বাতাস টানল, তারপর খুলে দিল দরজা। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল অমার্জিত, ইতর চেহারার দুই মাসলম্যান। পিছনে দলনেতা, সোনালি চুলের ছুঁচোমুখো। দ্রুত পিছিয়ে

এল জিম প্রেসটন, ছোট্ট করিডর পেরিয়ে সীটিংরূমে এসে দাঁড়াল। করিডরের একদিকে কিচেনের দরজা, অন্যদিকে কোট'স কাবার্ড।

সঙ্গীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে এল দলনেতা, চেঁচিয়ে পিছনের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিল। সশব্দে লেগে গেল দরজা। পরক্ষণেই বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো অল্প পরিসর করিডরে। কাবার্ড ও কিচেনের মুখোমুখি দরজা নিঃশব্দে বিস্ফোরিত হলো। প্রথম আঘাত হানল বিল টাশ। কিচেন থেকে বেরিয়েছে সে। ভারি একটা স্লাইড রেঞ্চ সজোরে বসিয়ে দিল সে ছুঁচোর এক স্যাঙাতের মাথার পিছনে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে।

বিপদ বুঝে অন্যজন পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘাড় ঘোরাতেই মাথার ওপর একটা নেইলবার তুলে ধরে অপেক্ষমাণ বিকট চেহারার রজার স্মিথকে দেখে জানের পানি শুকিয়ে গেল তার। ধাঁই করে ওটা তার মাঝ কপালে ঝেড়ে দিল স্মিথ। আঘাত পাওয়া জায়গাটা স্পর্শ করার জন্যে হাত তুলল সে, কিন্তু খানিক উঠেই থেমে গেল হাতটা। ঝুলে পড়ল শিথিল হয়ে। ঝপ্ করে বসে পড়ল সে, তারপর সটান শুয়ে পড়ল চিত হয়ে।

পরের দৃশ্যটা হলো দেখার মত। ঠিক তাড়া খাওয়া ছুঁচোর মতই দশা হলো ছুঁচোমুখোর। সঙ্গীদের দেহ টপকে টপকে দরজার সামনে পৌঁছে গেল সে দুই লাফে। খামচা-খামচি করছে দরজার গায়ে, হাতল ধরতে চাইছে। হাত বাড়িয়ে লোকটার স্কার্ফ মুঠো করে ধরল জিম প্রেসটন। পিছনে টেনে এনে দড়াম করে দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিল মুখের একটা পাশ।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক হেঁচকা টানে এ-পাশের দেয়ালে এনে ফেলল তাকে প্রেসটন। দেয়ালে ঝোলানো মোনালিসার বড় একটা কাঁচ বাঁধানো পোর্ট্রেটের ওপর পড়ল সে, কাঁচ ভেঙে গালের কয়েক জায়গায় গভীর ক্ষতের

সৃষ্টি হলো তার। বিল আর স্মিথ ওদিকে অজ্ঞান দুটোকে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে হতভম্ব দলনেতাকে সীটিংরূমের রাস্তার দিকে পিকচার উইণ্ডোর সামনে নিয়ে এল জিম প্রেসটন।

এক মিনিট পর তার ফ্ল্যাটের জানালা গলে দেহের অর্ধেকটা শূন্যে ভেসে পড়ল ছুঁচোর। বিল এবং রজার কোমর আর পা ধরে ঠেকিয়ে রেখেছে তার পতন। 'কার পার্কটা দেখতে পাচ্ছ নিচের?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল প্রেসটন।

ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল লোকটার। প্রেসটনের এখানে আসতে চায়নি সে প্রথমে। লুইস কিরলনস্কির ওখান থেকে বেরিয়ে ডেরায় ফিরে যাওয়ার পথে থেমে ওদের নিয়োগকর্তাকে টেলিফোনে প্রেসটনের নামটা জানিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পারেনি। এ দায়িত্বটাও লোকটা গছিয়ে দিয়েছে তার ঘাড়ে। অবশ্য মোটা টাকার বিনিময়েই।

ওই লোভই কাল হলো শেষ পর্যন্ত। ওরা যত বড় মাস্তানই হোক, ইস্ট লণ্ডনের। এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অনাহূত। তাছাড়া যতই নির্দয় আর কসাই হোক না কেন, এসব সাউথ লণ্ডনারদের তুলনায় ওরা দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া কিছু নয়। এদের হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতার কেচ্ছা শুনলে শহরের অন্য সব এলাকার মাস্তানদের মত ওদের মাথাও চক্কর খায়। বোঝা যাচ্ছে তেমনি এক দলের হাতেই ধরা খেয়েছে আজ ওরা কপাল দোষে।

দুঃখে চোখে পানি এসে পড়ার জোগাড় দলনেতার। আসার সময় ভেবেছিল এত রাতে কেউ কিছু টের পাবে না। কেউ জানবে না তাদের 'বর্ডার ক্রসিঙের' ব্যাপারটা। অথচ ঘটল কিনা উল্টো, পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে!

মাথা দোলাল দলনেতা, পাচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে তার কপালে। ঢোঁক গিলছে সে ঘন ঘন।

'ওখানে আছড়ে পড়ে লাশ হয়ে যাবে তুমি এখনই। দারুণ একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে।'

শিউরে উঠল সোনালিচুলো। 'না! প্লী-ই-জ! মেরো না আমাকে।'

'ঠিক আছে, মারব না। বিনিময়ে আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।'

'হ্যাঁ, দেব। সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

সীটিংরুমে নিয়ে আসা হলো লোকটাকে চ্যাঙদোলা করে। বসিয়ে দেয়া হলো মেঝেতে। প্রেসটন বসল তার মুখোমুখি একটা সোফায়। 'বুড়ো মানুষটাকে কেন খুন করলে তোমরা?' গলায় বিন্দুমাত্র রাগের আভাস নেই তার।

'কথা আদায় করতে গিয়ে…'

'কিসের কথা? কার হুকুমে?'

'একটা চোরাই জিনিসের কথা। ওটা নাকি তোমার কাছ থেকে পেয়েছে লোকটা, শুনলাম।'

'লোকটাকে যে তোমরা মেরে ফেলেছ, তা জানো?'

একটু থমকাল 'স্ল্যাগ'। 'দুঃখিত। লোকটার হার্টের অবস্থা জানতাম না।'

'কে গায়ে হাত তুলেছে ওর?'

'না। আসলে তেমন…'

'চড়াৎ' করে লোকটার ডান কানের ওপর প্রচণ্ড এক চড় বসাল জিম। 'শুয়োরের বাচ্চা! পুরো মুখ থেঁতলে গেছে লোকটার। চার-পাঁচটা রিব ভেঙে গেছে বুকের। কার হুকুমে করেছিস তোরা এসব!'

'নাম জানি না। টেলিফোনে নির্দেশ পেয়েছি আমরা। শুধু কাগজগুলো পেলেই…'

'কিগুলো?' হতভম্ব হয়ে গেল জিম প্রেসটন।

'কাগজগুলো।'

'কিসের কাগজ!'

'তা জানি না। ব্রিফকেসের মধ্যে ছিল। ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল প্রেসটন। মাথায় খেলছে না কিছু। অমন বহুমূল্য ডায়মণ্ড বাদ দিয়ে কয়েকটা কাগজ…। 'ওগুলো নেই। ফিরে গিয়ে তোমার বেশ্যার বাচ্চা নিয়োগকারীকে বলবে, ব্রিফকেসটা পুড়িয়ে ফেলেছি আমি। ওর মধ্যে কাগজ-টাগজ ছিল কি না জানি না আমি। ঠিক আছে?'

জোরে জোরে মাথা দোলাল লোকটা। 'হ্যাঁ।'

'হারামজাদাগুলোকে ওয়াটারলু ব্রিজ পার করে দিয়ে এসো,' বিল এবং স্মিথের উদ্দেশে বলল জিম প্রেসটন। আরেকটা চড় কষাল ছুঁচোর গালে। 'জীবনে আর কখনও ভুলেও যদি দক্ষিণ লণ্ডনে পা রেখেছিস, সেদিনই হবে তোর শেষ দিন। মনে থাকবে কথাটা?'

ভদ্রলোকের মত সম্মতি জানাল লোকটা। 'থাকবে।'

'যা, মড়াখেকোর বাচ্চা!'

ঠেলে গুঁতিয়ে ওদের তিনটেকে দরজার কাছে নিয়ে গেল বিল আর রজার। আহত দুটো চাপা গলায় কাতরাচ্ছে। পিছন থেকে ডাকল জিম। ছুঁচোমুখোকে দেখিয়ে বলল, 'আমার হয়ে ওকে কিছুদিন মনে রাখার মত শুভেচ্ছা জানিয়ে দিয়ো। বুড়োর আত্মা খানিকটা শান্তি পাবে তাতে।'

হাসি ফুটল দাগী দুই সাউথ লণ্ডনারের কাটাকুটি ভরা মুখে। 'অবশ্যই। ভাববেন না,' বলল বিল টাশ।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে কিচেনে চলে এল প্রেসটন। কড়া করে এক কাপ এসপ্রেসো বানাল। আজ রাতে আর ঘুম আসবে না ওর কিছুতেই। কাজেই অহেতুক শুয়ে গড়িয়ে পিঠ ব্যথা না করে খানিক চিন্তা ভাবনা করা যাক।

কাপ নিয়ে বেডরুমে এসে বসল সে। ব্রিফকেসের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ আছে? ওগুলো উদ্ধার করার জন্যে ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছে ওর মালিক? কিসের কাগজ? কি করে জিমের সন্ধান পেল লোকটা?

তার কাছে ডায়মণ্ড নয়, কাগজগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ? গোপন জায়গা থেকে ব্রিফকেসটা বের করল জিম প্রেসটন। ভেতরটা ফাঁকা, জানা আছে তার। অর্থাৎ আর কিছু থেকে থাকলে আছে ওটার কোন ফলস্ কম্পার্টমেন্টে। এই সম্ভাবনার কথা ভুলেও ভাবেনি সে আগে।

এবার পেশাদার ক্র্যাকস্‌ম্যানের মত ব্রিফকেসটা পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করল জিম। এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলল ব্যাপারটা। আছে! দুই চুমুকে ঠাণ্ডা হয়ে আসা পানীয়টুকু ভেতরে চালান করে দিল প্রেসটন। তারপর একটা কাগজ কাটা ছুরি নিয়ে লেগে পড়ল কাজে। ছ' মিনিট পর শিস্ বাজাল সে ঠোঁট গোল করে। খুলে গেছে ফলস্ বেইস। ভেতর থেকে বের হলো দশটা ফটোকপি শীট।

সরকারী কাগজপত্রের ব্যাপারে খুব একটা জ্ঞান নেই জিম প্রেসটনের। তবে ওগুলোর মাথায় মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের ছাপ এবং বড় অক্ষরে লেখা 'টপ সিক্রেট' কথাটার অর্থ বুঝতে দেরি হলো না বিন্দুমাত্র। আনমনে শিস্ বাজিয়েই চলেছে প্রেসটন। ব্রিফকেসের মালিকের পেশাগত পরিচয় খুব ভাল করেই জানে সে। ওরকম একজন সম্মানিত পদস্থ কর্মকর্তা…না কি এর মধ্যে দোষের কিছু নেই?

বড় অফিসাররা অফিসের কাজ কখনও কখনও বাসায় বসেও করে থাকেন ফাইল-পত্র নিয়ে এসে। এক্ষেত্রেও কি সে রকম কিছু…? না, প্রবলবেগে মাথা দোলাল জিম। হতে পারে না। হলে অবশ্যই ব্যাপারটা পুলিসকে জানানো হত এতদিনে। টিভি-পত্রিকায় গ্লেন ডায়মণ্ড চুরি হওয়ার

খবর প্রকাশ হত। তাহলে? কাগজগুলো নিয়ে কি করা যায় ভাবতে বসল প্রেসটন।

ঠিক যেন ফণাতোলা বিষধর সাপ দেখছে খুব কাছ থেকে, এমন চেহারা করে কাগজগুলোর দিকে চেয়ে আছে গিলটি মিয়া। মুখোমুখি গালে হাত দিয়ে বসা জিম প্রেসটন। রাতেই কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে গিলটি মিয়ার সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে। সংস্কারাচ্ছন্ন জিমের দৃঢ় বিশ্বাস, ওস্তাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়েছিল বলেই ডায়মণ্ডগুলো চুরি করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে।

সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে তার সতর্কবাণী। চোরাই মাল দেখেই গিলটি মিয়া তাকে সাবধান করে বলেছিল, এর মধ্যে অশুভ কিছু আছে। কাজেই তার সঙ্গে কথা না বলে ওগুলো নষ্ট করা ঠিক হবে না বলে রেখে দিয়েছিল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে গিলটি মিয়া, একটা শীটও স্পর্শ করেনি কেন যেন।

'কি নাম বললি এর মালিকের?' ব্রিফকেসটা দেখাল সে ইঙ্গিতে।

'রবার্ট ফিলবি। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির বড় অফিসার।'

'হুঁম!' ঠোঁট মুড়ে আরও খানিক ভাবল গিলটি মিয়া। 'খালি হাতে ছুঁস্‌নি তো কাগজগুলো?'

'ছুঁয়েছি, ওস্তাদ। তখন আসলে অত ভেবে দেখিনি। ঝোঁকের মাথায়...।'

'ঠিক করিস্‌নি, ভাবা উচিত ছিল। ফিলবি লোকটা বিশ্বাসঘাতক, বেঈমানি করচে দেশের সাতে কুনো সন্দেহ নেই। নিচ্চয় এগুলোয় হারামজাদার হাতের ছাপ পাওয়া যেত খুঁজলে। কিন্তু তুই ধরেই ঝামেলা

পাকিয়ে ফেললি। যাক্‌গে, এগুলো নিয়ে একন কি করবি ঠিক করেচিস্‌?'

'আমি ওসব বুঝি না, ওস্তাদ। আপনি যা বলেন তাই হবে।'

যেন এমন কিছু শোনার অপেক্ষায়ই ছিল গিলটি মিয়া। কাগজগুলো কাছে টেনে নিয়ে এল সে হাতে ধরে।

'করেন কি, ওস্তাদ, করেন কি! আপনার হাতের ছাপ...'

'চুপ থাক্‌! ম্যালা ফ্যাঁচফ্যাঁচ করিস্‌নে। এক টুকরো কাপড় লিয়ে আয় দিকিন!'

বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ পালন করল জিম প্রেসটন। ঝুঁকে বসে কাজে লেগে পড়ল গিলটি মিয়া।

পাঁচ

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। দু'হাতে কপালের দু'পাশের রগ চেপে ধরে বসে আছেন সংস্থার প্রধান, স্যার মারভিন লংফেলো। দৃষ্টি উদভ্রান্ত। সামনে বিছিয়ে রাখা কাগজগুলোর ওপর মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে, কিন্তু পারছেন না। সারা দেহ কাঁপছে বৃদ্ধের, দুর্বল বোধ করছেন। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কপালের রগ ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়।

কাগজগুলো একটু আগে পৌঁছেছে লংফেলোর টেবিলে। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে। বাদামি রঙের পুরু খামে। ওপরে ফেল্ট টিপ্‌ পেনে আঁকাবাঁকা অক্ষরে তাঁর নাম এবং সংস্থার ঠিকানা লেখা। লেখার ধরনটা

আকৃষ্ট করেছিল লংফেলোকে। তাই আগ্রহ নিয়ে ওটাই প্রথমে খুলেছিলেন। পরমুহূর্তে চোখ কপালে উঠে গেছে, হাঁ করে ভেতর থেকে বেরোনো কাগজগুলোর দিকে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ তখন থেকে। সাধারণ খামে, নিয়মিত ডাকে এসব 'টপ্ সিক্রেট' ডকুমেন্ট আসতে পারে, ব্যাপারটা তাঁর কল্পনারও অতীত।

এগুলো কে পাঠাল, সে কোথায় পেল, কি করা যায় এ ব্যাপারে, কি করা উচিত ইত্যাদি হাজারো দুশ্চিন্তায় দিশেহারা অবস্থা লংফেলোর। মাথা খারাপ হওয়ার দশা প্রায়। ঘোলা চোখে আবার কাগজগুলোর ওপর নজর বোলালেন তিনি। নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল এগুলো। পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের ওপর সোভিয়েত সামরিক হুমকি প্রতিহত করার কনটিঞ্জেন্সি প্ল্যান। অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

শেষবারের মত কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখলেন লংফেলো। খালি হাতেই নাড়াচাড়া করছেন, কারণ প্রথমবারই গুরুত্ব না বুঝে ছুঁয়ে ফেলেছিলেন তিনি ওগুলো। কাঁপা হাতে শীটগুলো গোছালেন বৃদ্ধ একটা একটা করে, যথাসম্ভব আলগোছে। এমন সময় ইন্টারকম বেজে উঠল। 'মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন, স্যার।'

'রানা!' অথৈ সমুদ্রে পড়া মরণাপন্ন মানুষ ডুবে যাওয়ার আগমুহূর্তে যেন জীবনতরীর সন্ধান পেয়েছে। তড়াক করে আসন ছাড়লেন লংফেলো। কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'শো হিম ইন, প্লীজ!' দ্রুত পা বাড়ালেন দরজার দিকে। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। সামনেই দাঁড়িয়ে স্যুটেড বুটেড মাসুদ রানা।

'রানা!' ইংরেজি কেতা ভুলে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ। 'কংগ্রাচুলেশনস! মাই বয়, কংগ্রাচুলেশনস!'

'ধন্যবাদ, স্যার।' অনেক কষ্টে লংফেলোর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল ও।

'এসো এসো, বোসো। তোমার এজেন্সি ফ্রি ইনভেস্টিগেশন লাইসেন্স পাওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি, রানা। আয়্যাম সো হ্যাপি।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এ ব্যাপারে বিএসএস এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমার জন্যে যা করেছেন, সেই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না আমি।'

'শুধু শুধু বাড়িয়ে বলছ তুমি, রানা। বরং তোমার ঋণই আমরা শোধ করতে পারব না কোনদিন। প্রচুর করেছ তুমি বিএসএস-এর জন্যে। তোমাকে সাপোর্ট দিয়ে সেই ঋণই খানিকটা শোধ করলাম এই সুযোগে। সে যাক্, বলো, তোমার নেক্সট প্রোগ্রাম কি?'

'আপাতত ঢাকায় ফেরা।'

'তাই?' চেহারা নিষ্প্রভ হয়ে গেল লংফেলোর। 'কবে যেতে চাইছ?'

'আজ রাতেই, স্যার।'

'আজই?' পুরোপুরি হতাশ হলেন বৃদ্ধ। ওর আসার খবরে যার-পর-নাই খুশি হয়েছিলেন, ভাবছিলেন সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু ও চলে যাচ্ছে শুনে সিদ্ধান্তটা পাল্টালেন লংফেলো। না, থাক। তাতে রানা ভাববে, সাহায্য করার প্রতিদান হিসেবে ওর ঘাড়ে কায়দা করে নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

'খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?'

'চিন্তা? হ্যাঁ, না মানে তেমন...।' খেই হারিয়ে থেমে পড়লেন লংফেলো।

'নতুন কোন ঝামেলা?'

খানিক আমতা আমতা করলেন তিনি। বলবেন, কি বলবেন না, ঠিক

করতে পারছেন না। কিন্তু মাসুদ রানা এক দৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে, এ অবস্থায় না বলে থাকাও সম্ভব নয়। যা হয় হোকগে, ভাবলেন বৃদ্ধ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, রানা। ঝামেলাই। বেশ অভাবনীয় ঝামেলা। কি করে যে এ থেকে উদ্ধার পাব বুঝতে পারছি না। আগে এই কাগজগুলোয় চোখ বোলাও, তারপর শুনো,' ফটোকপিগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

দুটো শীট দেখেই মুখ তুলল রানা। 'ন্যাটো ডকুমেন্ট!' ভুরু কুঁচকে উঠেছে ওর। 'এসব আপনার কাছে কেন?'

'সে প্রশ্ন তো আমারও, রানা।'

'বুঝলাম না।'

অল্প কথায় ঘটনাটা খুলে বললেন লংফেলো। 'প্রত্যেকটা হাইলি ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট। কি করে হোয়াইটহলের বাইরে এল, কার মাধ্যমে, বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে এসব। ফলে কী পরিমাণ ক্ষতি হলো ব্রিটেন এবং তার ন্যাটো মিত্রদের অনুমান করাও অসম্ভব। সবচে' বেশি যেটা ভাবাচ্ছে আমাকে, তা হলো হোয়াইটহল থেকে এগুলোর বাইরে আসার ব্যাপারটা। এ অবিশ্বাস্য! বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ছাড়া কোনমতেই এসব ডকুমেন্টের বাইরে আসার কথা নয়, রানা।'

'বিশেষ ব্যবস্থাটা কি?'

'প্রয়োজন পড়লে সীল করা ব্যাগে, কড়া সিকিউরিটির মাধ্যমে হোয়াইটহলের বাইরে আসতে পারে এগুলো। শুধুমাত্র ফরেন অফিস আর কেবিনেট অফিসে যাওয়ার জন্যে। আর কোথাও নয়। তাও খুব কম, খুবই কম।'

'এই আসা-যাওয়ার পথেই কেউ হয়তো ওগুলো বের করে ফটোকপি করিয়ে নিয়েছে সিকিউরিটিকে টাকা খাইয়ে, হতে পারে না?'

'পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাগের সীল ভাঙতে হবে, যা আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কারও পক্ষেই, এবং সীলে কোন অস্বাভাবিকতা থাকলে ফরেন বা কেবিনেট অফিস তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করবে আমাদের কাছে। কিন্তু তেমন কোন রিপোর্ট কখনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কালপ্রিট নিশ্চয়ই এতজনকে ঘুষ খাইয়ে…মানে, তা সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ সীল করা এবং ভাঙা, উভয় সময়ই চারজন করে সচিব পর্যায়ের হাই অফিশিয়াল সামনে উপস্থিত থাকেন।'

সেক্ষেত্রে সত্যিই সম্ভব নয়, মনে মনে স্বীকার করল মাসুদ রানা।

'আবার ধরো, কেউ ডকুমেন্টগুলো বাসায় বসে স্টাডি করবে বলে নিয়ে গেছে; তাও সম্ভব নয়। এ ধরনের নিয়ম নেই। বাকি থাকে একটাই বিকল্প। কখনও কখনও এসব স্টাডি করে দেখার জন্যে বড় বড় অফিসারদের টেবিলে দেয়া হয়। আমার বিশ্বাস, সেই সুযোগটাই কেউ নিয়েছে। গোপনে ফটোকপি করিয়েছে সুযোগ বুঝে, তারপর অফিসেরটা অফিসে ফিরিয়ে দিয়েছে। চোর যে-ই হোক, সচিব পর্যায়ের নিচে নয়।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল মাসুদ রানা। 'এখানে পৌঁছার আগে কয় হাত ঘুরেছে খামটা?'

'সর্টিং অফিসে দু'চারহাত ঘুরেছে নিশ্চয়ই। তারপর পোস্টম্যান, যে ডেলিভারি দিয়ে গেছে।'

'ভেতরের ওগুলো আপনি ছাড়া আর কেউ দেখেছে?'

'নাহ, আমিই খুলেছি খাম।'

'যে হাতিয়েছে, খুঁজলে হয়তো তার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে এতে,' অন্যমনস্কের মত বলল রানা। খেয়াল করেছে ও, দশটা ডকুমেন্ট একই মাসে প্রস্তুত করা হয়েছে, দশটা বিভিন্ন তারিখে, প্রায় পুরো মাস ধরে। সবগুলো হাতানোর জন্যে পুরো মাস চলেছে চৌর্যবৃত্তি। কারণ প্রতিটি

দলিল হাইলি ক্লাসিফায়েড। সাংঘাতিক গুরুত্ববহ, অবশ্যই ন্যাটোর প্রতিপক্ষের জন্যে।

'ঠিক বলেছ,' মাথা দোলালেন লংফেলো। 'ল্যাবে পাঠিয়ে দেখা যাক, কি ফল হয়।'

দলিলগুলো যে-ই পাঠিয়ে থাকুক এখানে, সে কোথায় পেল? ভাবল মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই পথেঘাটে কুড়িয়ে নয়, তাহলে?

ওগুলো ল্যাবে পাঠানো হলো। এক ঘণ্টা ধরে সবকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল চীফ টেকনিশিয়ান, তারপর হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকাল উপস্থিত লংফেলো ও মাসুদ রানার উদ্দেশে। 'দুঃখিত, স্যার। আপনাদের দুজনের ছাড়া আর কারও প্রিন্ট নেই। তবে ছিল, কোন সন্দেহ নেই।'

'মুছে ফেলা হয়েছে?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'রাইট, স্যার। কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে। ফাইবারের বসে যাওয়া দাগ বোঝা যায় পরিষ্কার।'

মস্কোর পশ্চিমে, উসপেনস্কো ব্রিজ পেরিয়ে কিছুদূর এগোলেই মস্কভা নদীর তীর ঘেঁষে চোখে পড়বে দাচা কমপ্লেক্স। কয়েক হাজার একর জুড়ে সাজানো-গোছানো, নয়নাভিরাম অসংখ্য কৃত্রিম গ্রাম। একটার পর একটা, গুণে শেষ করা যায় না। প্রতিটি দাচা বার্চ আর পাইনঘেরা। কর্মকর্তাদের শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে ওগুলোর আকার।

নামকরা শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং সামরিক বাহিনীর বড় বড় অফিসারদের দাচা পেরেদেলকিনোয়। এগুলোর আকার এবং গঠনশৈলি মোটামুটি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পলিটব্যুরোর সদস্যদের নিচের কর্মকর্তাদের দাচা ঝুকভকায়। এগুলো মোটামুটির থেকে যথেষ্ট বড় আর উন্নত। এর পরেরগুলো উসভোয়। সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যদের দাচা।

এগুলোর আকার, সৌন্দর্য আর জৌলুসের ছড়াছড়ি এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর। সবশেষে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের প্রধানের দাচা। ওটাও উসভোতেই।

রাশিয়ায় দাচা বলা হয় গ্রামের বাড়িকে। সেই দাচার সঙ্গে এই দাচার কোন মিলই নেই। শ' শ' আকাশছোঁয়া বার্চ আর পাইনঘেরা প্রতিটি দাচার পাহারায় রয়েছে সাদা পোশাকের নাইনথ্ ডিরেক্টরেট বা ক্রেমলিন গার্ড বাহিনী। ভ্লাস্তিদের নিরাপত্তা রক্ষায় সদা প্রস্তুত।

এখানেই ইনটেনসিভ সেশনে বসছে রোজ অ্যালবিয়ন কমিটি। দিন-রাত মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা প্রেসিডেন্টের অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে।

চিন্তায় পড়ে গেছে রানা মারভিন লংফেলোর সমস্যাটা নিয়ে। ও যদি ব্যাপারটা না জানত, কোন কথা ছিল না। নিশ্চিন্তে রওনা হয়ে যেতে পারত ঢাকার পথে। কিন্তু জানতে গিয়েই বিপদ বাধিয়ে ফেলেছে ও। জেনে শুনে মুখ বুজে থাকা যায় না, অন্তত বিএসএস না হোক, লংফেলোর কথা ভেবে হলেও একটা কিছু করা উচিত। এই 'একটা কিছু' যে কি, তা নিয়েই চিন্তায় পড়ে গেছে মাসুদ রানা।

রানা এজেন্সির ফ্রি ইনভেস্টিগেশন লাইসেন্স পাওয়ার ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছেন ওকে বৃদ্ধ। এই লাইনের সবাই যখন রানার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তখন লংফেলোই নিয়েছিলেন ওর পক্ষ। সতীর্থদের ভ্রূকুটি, অনুযোগ কিছুই গায়ে মাখেননি। সেই মানুষটি এতবড় বিপদে পড়েছেন জেনেও কি করে যায় রানা? বিবেক সায় দেয়নি। তাই যাত্রা কয়েকদিন পিছিয়ে দিয়েছে ও। যদিও লংফেলো মুখে বলেননি, কিন্তু ওঁর চোখ দেখেই রানা বুঝে নিয়েছে কি চাইছেন তিনি মনে মনে। আশা করে আছেন, ডকুমেন্টগুলো চুরি রহস্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব ও নিক।

কিন্তু বলতে পারছেন না। কেন পারছেন না, বোঝে মাসুদ রানা। বললে ও অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। ভাবতে পারে, ওকে সাহায্য করে তার প্রতিদান চাইছেন লংফেলো। তাই ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারেননি। ওদিকে গিলটি মিয়াও পড়েছে সমস্যায়। সবকিছু ঠিকঠাক, অথচ শেষ সময় রানা মন পাল্টাল কেন ভেবে পাচ্ছে না। একবারই বাইরে গিয়েছিল আজ রানা। কোথায়, জানে গিলটি মিয়া। ওটাই হয়েছে সমস্যা। বারবার প্রেসটনের চুরি করা ব্রিফকেসের কাগজগুলোর কথা মনে আসছে।

কাগজগুলো গিলটি মিয়া নিজ হাতে বিএসএস-এর ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়েছিল। তখন আসলে এতটা ভেবে দেখেনি সে। মাথায় ছিল ওগুলো সঠিক স্থানে পৌঁছে দেয়ার চিন্তা। এখন তার মনে হচ্ছে, ওটাই মাসুদ রানার যাত্রাবিরতির কারণ। অনেকক্ষণ থেকেই রানার আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে সে কারণে-অকারণে। ব্যাপারটা খুলে জানাতে চায় ওকে। কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তাছাড়া রানাও চিন্তিত। হঠাৎ করেই সুযোগটা পাওয়া গেল। নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরাল।

'তুমি কিছু বলবে, গিলটি মিয়া?' ঘোরাঘুরি করছে লোকটা, নজর এড়ায়নি রানার।

মাথা চুলকাল গিলটি মিয়া। 'স্যার, মানে একটা কতা…'

'কি কতা তাড়াতাড়ি বল। আমি ব্যস্ত।'

'ভেবেচেন আমি তা বুজিনি? ওসব আমি, স্যার, খুব…।' রানাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে প্যাচাল থামাল গিলটি মিয়া। 'মানে ক্যালকাটার আমার এক সাকরেদ…।'এবারও থেমে পড়তে বাধ্য হলো সে টেলিফোন বেজে উঠতে। মাসুদ রানার টেবিলের লাল ফোনটা। থাবা চালাল রানা রিসিভার লক্ষ্য করে, অন্য হাতে গিলটি মিয়াকে অপেক্ষা করতে বলল।

'হ্যালো!'

'রানা?' জলদগম্ভীর চিরপরিচিত গলাটা চিনতে পারা মাত্র বুকের রক্ত ছলকে উঠল ওর। ঢাকা থেকে বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল রাহাত খান (অবসরপ্রাপ্ত)।

'জ্বি, স্যার,' সিধে হয়ে বসল ও। চট করে হাতঘড়ির ওপর নজর বুলিয়ে নিল। বিকেল চারটা। তারমানে ঢাকায় রাত দশটা। বাসা থেকে করেছে নিশ্চয়ই বুড়ো। কি এমন জরুরি...।

'কেমন আছো?'

'জ্বি, ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, ভাল। তোমার ফ্রি ইনভেস্টিগেশনের লাইসেন্স পাওয়ার খবর শুনলাম। কংগ্রাচুলেশনস।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' জিভ কাটল মাসুদ রানা। খবরটা ওর নিজেরই দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু নানান ঝামেলায় দিতে পারেনি।

'তোমার ফ্লাইট ক'টায়। রওনা হচ্ছো আজ?'

'না, স্যার। একটু ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি, স্যার। বিএসএস-এ হঠাৎ করে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু ন্যাটো ডকুমেন্ট...'

'আমি শুনেছি, রানা। কথা হয়েছে লংফেলোর সঙ্গে। তা ইয়ে, ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছ কিছু?'

'ভাবছি এখনও, স্যার। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। এই কারণেই যাওয়া পিছিয়ে দিয়েছি।'

'ভালই করেছ। আমার মনে হয় এ সময় লংফেলোকে খানিকটা সাহায্য করা গেলে মন্দ হত না। যথেষ্ট করেছে ও তোমার জন্যে।'

'আমিও তাই ভাবছি, স্যার।'

'গুড।'

'এ ব্যাপারে স্যার লংফেলো আপনাকে কোন অনুরোধ করেছেন,

স্যার?'

'না না। কেবল ঘটনাটা জানিয়েছে। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে ওকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম। তখন ঘটনাটা বলল লংফেলো। ও হয়তো লজ্জায় পড়ে গেছে। বলতে পারেনি আমি অন্য কোন কিছু মনে করে বসতে পারি ভেবে।'

'আমারও সেরকমই ধারণা, স্যার। অন্য সময় হলে ভদ্রলোক কাজটা করে দেয়ার অনুরোধ করতে দ্বিধা করতেন না। আপনি কি, স্যার, কাজটা নিতে বলছেন?'

'না, রানা। নেয়া না নেয়া তোমার ইচ্ছে। তবে আমার মনে হয় নিলে মন্দ হত না। অনেক সাহায্য করেছে তোমাকে লংফেলো।'

ভড়ং গেল না বুড়োর, ভাবল মাসুদ রানা। রাহাত খান মনে মনে ঠিকই চাইছেন কাজটা ও নিক। অফিশিয়াল কাজের বাইরে কাউকে কিছু করতে সরাসরি কখনোই বলেন না কট্টর বুড়ো। বলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, যাতে কেউ না ভাবে তার ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাইছেন তিনি। কৌশলটা মন্দ নয়। 'কাজটা তাহলে নিচ্ছি আমি, স্যার।' সোজাসুজি বললেই হয়, কাজটা নিয়ে নাও, তা নয়। গজ গজ করল ও মনে মনে।

'ভালই হয় তাহলে, রানা। লংফেলো খুব খুশি হবে।'

সব স্যার লংফেলোর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, নিজের যেন কোন অনুভূতি নেই। 'ঠিক আছে, স্যার। নিলাম আমি কাজটা।'

'ভেরি গুড। তো, রাখলাম তাহলে।'

'জ্বি। স্লামালেকুম।'

রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল। 'কি যেন বলছিলে তখন তুমি?'

'আমার এক সাকরেদের কতা, স্যার।'

'কোন লাইনের, থ্রী সেবেনটি নাইন?'

হেসে ফেলল গিলটি মিয়া রানা ওকে নকল করছে দেখে। 'জ্বি, স্যার।'

'কি হয়েছে তার?'

'ওর কিচু হোইনিকো।'

'তবে?'

'কদিন আগে এক বাসায় চুরি করতে গেছল ও। গতমাসের শেষ তারিকে।'

'একত্রিশে ডিসেম্বর?'

'জ্বি। ওর পচোন্দের ক'টা ডায়মন।'

'হুঁম! তারপর? ধরা পড়েছে?'

'না, স্যার। পেসটন ধরা পড়ার বান্দাই লয়।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। তাড়াতাড়ি শেষ করো। কাজ আছে আমার, বাইরে যাব।'

'আপনি যে কাজে যাচ্চেন, সেই ব্যাপারেই...মানে...।' থেমে মাথা চুলকাতে লাগল গিলটি মিয়া।

থমকে গেল মাসুদ রানা। 'সেই ব্যাপারেই মানে! তুমি জানো আমি কি কাজে যাচ্ছি?'

'জানি, স্যার। সকালে যেকেনে গিয়েচিলেন, সেকেনেই যাচ্ছেন আবার। কাগজগুনো কে পেটিয়েচে ওদের ঠিকানায়, তা...'

সিধে হয়ে গেছে রানা আগেই। তাজ্জব হয়ে চেয়ে আছে গিলটি মিয়ার দিকে। 'তুমি কি করে জানো ওগুলোর কথা?'

'লে হালুয়া! জানব না কেন, স্যার। আমিই তো পেটিয়েছি ওগুনো।'

'কি!' চোখ কপালে উঠল মাসুদ রানার।

'তবে আর বলচি কি! ভেবেচিলুম কেউ কিচু টের পাবে না। কিন্তুক

আপনাকে এই ঝামেলায় এঁটকে…জ্বি?'

'এদিকে এসো। বোসো আমার সামনে।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল গিলটি মিয়া। মাটি থেকে চার ইঞ্চি ওপরে ঝুলছে ওর পা জোড়া। স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ চেয়ারে বসলে এই অবস্থাই হয় লোকটার। রানাকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে খানিকটা ভড়কে গেছে যেন।

'খুলে বলো পুরো ঘটনা। একটিও বাড়তি কথা নয়।'

'জ্বি,' একান্ত বাধ্যগতের মত মাথা দোলাল সে।

'নাও, শুরু করো।'

শুরু করল গিলটি মিয়া। অভ্যেসবশে কয়েকবারই মুখ থেকে বাড়তি বেফাঁস দুই একটা শব্দ যে বেরোয়নি, তা নয়। তবে প্রতিবারই রানার নীরব শাসানি বেলাইন থেকে খুব দ্রুত লাইনে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে তাকে। এক সময় থামল গিলটি মিয়া।

উঁচু পিঠের রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। চোখ টেবিল ল্যাম্পের গোড়ায় বসানো সুইচের ওপর। অন্যমনস্ক। 'ওকে এখনই একবার নিয়ে আসতে পারবে আমার কাছে? কোন বাসা থেকে চুরি করেছে দেখিয়ে দেবে দূর থেকে।'

'নিশ্চয় পারব। কিন্তু…।'

'ভয়ের কোন কারণ নেই। কোন ক্ষতি হবে না তোমার সাগরেদের। শুধু বাসাটা আমাকে দেখিয়ে দিলেই চলবে।'

'ঠিক আচে,' টুপ করে নেমে পড়ল গিলটি মিয়া। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজেকে বাহবা দিল রানা হাতে নেয়ার আগেই অর্ধেক সমস্যা আপনাআপনি সুরাহা হয়ে গেল বলে। এখন কায়দা করে ডকুমেন্ট চোরের

স্বীকারোক্তিটা আদায় করা গেলেই বাকি অর্ধেক সমাধা হয়ে যাবে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিরল গিলটি মিয়া। কি বলেছে জিম প্রেসটনকে, সে-ই জানে। নিশ্চিন্ত মনে চলে এসেছে। কিন্তু রানার অফিসরুমে পা দিয়েই মুখের চেহারা বদলে গেল প্রেসটনের। আইনের লোক চিনতে ভুল হয় না তার। থেমে পড়ল সে মাসুদ রানাকে দেখে। চাপা স্বরে বলে উঠল, 'এই ছিল তোমার মনে, ওস্তাদ?'

'চুপ কর! ম্যালা ম্যালা কতা বলিস। স্যার, এই আমার সাকরেদ।'

'জিম প্রেসটন?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা। বুঝে ফেলেছে লোকটার মনোভাব।

'জ্বি, স্যার।'

'বোসো।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে ওস্তাদের দিকে তাকাল প্রেসটন। খেঁকিয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'কলাগাচের মতন ডেঁড়িয়ে আচিস যে তবু?'

এগিয়ে এসে রানার মুখোমুখি বসল প্রেসটন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। 'যে বাসা থেকে ডায়মণ্ড চুরি করেছ, সে বাসাটা আমাকে শুধু চিনিয়ে দেবে তুমি। ঘাবড়াবার কিছু নেই, তোমার কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছি না আমি।'

উত্তর দেয়ার আগে আরেকবার গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল প্রেসটন।

'ভয় পাসনে। কুনো ক্ষতি হবে না তোর। স্যার খুব দয়ালু মানুষ। শুদু বাসাটা দেকিয়ে দিয়েই তুই খালাস। বুজলি?'

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিম প্রেসটন। 'আচ্ছা।'

'আরে, রানা!' অবাক হয়ে গেলেন লংফেলো। 'তোমার না আজই চলে যাওয়ার কথা?'

'ছিল। কিন্তু পরে আরও কিছুদিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' হাসছে রানা।

'কেন?'

'ঠিক করেছি কাজটা শেষ করেই ফিরব।'

চশমাটা ঠেলে ওপর দিকে তুললেন বৃদ্ধ। আরও একটু ভাল করে তাকালেন ওর দিকে। 'কোন কাজ?'

'ন্যাটোর ডকুমেন্টস চোরকে ধরা।'

'তুমি সিরিয়াস, রানা?'

'অবশ্যই।'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল বৃদ্ধ লংফেলোর। 'গড ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড।'

ছয়

ডোরবেলের আওয়াজে রবার্ট ফিলবি নিজেই দরজা খুললেন। সামনে দাঁড়ানো প্রায় তাঁর সমান লম্বা নিষ্ঠুর চেহারার যুবকের দিকে চেয়ে থাকলেন বিমূঢ়ের মত। চেহারাটা খুবই পরিচিত মনে হলেও চিনতে পারছেন না। হাতে একটা ব্রিফকেস যুবকের।

'গুড ইভ়নিং,' বলল আগন্তুক।

'ইভনিং?' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়েই আছেন রবার্ট ফিলবি।

হিপ পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল যুবক, তুলে ধরল চোখের সামনে। পরমুহূর্তে চেহারা বদলে গেল ফিলবির এবং একই সঙ্গে যুবককেও চিনে ফেললেন। মনের ভেতর বেজে উঠল বিপদের ডঙ্কা। এ লোক কি চায় আমার কাছে? ভাবলেন ফিলবি। 'মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ভেতরে আসতে পারি?' গমগমে কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা। প্রথমেই লোকটার মনে ভয় এবং দ্বিধা ঢুকিয়ে দিতে চায় ও। এতে বাকিটা সহজ হয়ে যাবে।

'নিশ্চই। আসুন,' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন রবার্ট ফিলবি। তাঁর চোখের তারায় আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখল মাসুদ রানা। দরজা বন্ধ করার আগে একবার করিডরে উঁকি দিলেন তিনি। সম্ভবত ওর সঙ্গে আর কেউ আছে কি না দেখে নিলেন। ঘুরে জোর করে ফোটানো হাসি মুখে রানাকে সীটিংরূম নির্দেশ করলেন।

'লেডি ফেডোরা বাসায় নেই?' বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। ও ওর ভাইয়ের কাছে বেড়াতে গেছে। শেফিল্ডে।' ওর মুখোমুখি বসলেন ফিলবি। 'বলুন, কি উপকারে লাগতে পারি আপনার?'

সামনের দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। তারপর পুরো ঘরের ওপর। ঠিকই বলেছিল জিম প্রেসটন। এ ঘরের ব্যাপারে তার দেয়া বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে। দেয়ালটা নিশ্চয়ই রিপেয়ার করিয়েছে লোকটা, ভাবল ও।

'মিস্টার রানা...!'

সরাসরি ফিলবির চোখে চোখ রাখল মাসুদ রানা। এমনভাবে চেয়ে থাকল যেন ঘোরের মধ্যে আছে। পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেসটা দু'হাঁটুর ওপর রেখে খুলল ও। ভেতর থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল সামনে। 'বলছি। তার আগে দয়া করে এগুলো দেখুন।'

নিলেন ওগুলো রবার্ট ফিলবি। দ্রুত চোখ বোলালেন প্রথম শীটটার ওপর। তারপর দ্বিতীয় শীট। তৃতীয় শীট। এই শীটটার মাঝামাঝি এসে থমকে গেল তাঁর দৃষ্টি। ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। 'এগুলো··· এগুলো··· ।'

'হ্যাঁ। প্লেন ডায়মণ্ডের সঙ্গে এগুলোও চুরি গিয়েছিল আপনার,' যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল মাসুদ রানা। 'কিন্তু চোর লোকটা বোঝা যায় ভালই। নষ্ট না করে দলিলগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল বিএসএসের ঠিকানায়। তাকে ট্রেস করতে পেরেছি আমরা এবং তার কাছ থেকেই পেয়েছি আপনার নাম।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বোবা-কালা বনে গেলেন রবার্ট ফিলবি। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে কেউ। অনেকক্ষণ পর গলায় স্বর ফোটাতে সমর্থ হলেন ফিলবি। 'এগুলো বিএসএসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে? কিন্তু আপনি···?'

'এ কেসের দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে, তাই।'

আবার দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন ফিলবি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ঝড়ের গতিতে কাজ করছে মাথা। 'অস্বীকার বা কথা লুকোবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, মিস্টার ফিলবি। ওর প্রতিটিতে আপনার অসংখ্য হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। আপনার ফলস কম্পার্টমেন্টওয়ালা ব্রিফকেসটাও বর্তমানে আমার হেফাজতে। অতএব বুঝতেই পারছেন, সব বলে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেক্ষেত্রে আমি হয়তো আপনার বাঁচার একটা উপায় বাত্‌লে দিতে পারব।' একগাদা মিথ্যে বলে গেল রানা।

চিন্তিত মুখে ডান জুলফির গোড়া চুলকালেন রবার্ট ফিলবি। চোখ মাটির দিকে। আমি শেষ হয়ে গেছি, ভাবছেন তিনি। সব শেষ। অর্থ-যশ, সম্মান-চাকরি, সব গেল। কি সাজা হবে তাঁর? আজকের পর এ মুখ কি করে

বাইরে দেখাবেন?

'মিস্টার ফিলবি, একটা মহল উঠেপড়ে লেগেছে আপনাকে গ্রেফতার করার জন্যে। ইন্টারোগেট করতে চায় আপনাকে। তারপর কি জুটবে আপনার ভাগ্যে জানেন? স্রেফ দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে। ক্রাউন কাউন্সিল বিন্দুমাত্র কৃপা দেখাবে না। মিডল-ক্লাস কারাগার জুটবে কপালে। বিচার হবে মিডল ক্লাস কোর্টে। সারাদেশ জানবে, দুনিয়া জানবে একজন ব্রিটিশ দেশদ্রোহীর পরিচয়, সেটা কি ভাল হবে?'

আরও একগাদা ডাঁহা মিথ্যে বলে গেল রানা গড়গড় করে। রবার্ট ফিলবিকে গ্রেফতার করলে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের আওতায় মামলা দায়ের করতে হবে। ওখানে কোন সমস্যা হবে না, হবে তার পরপরই। কোর্টে টিকবে না মামলা প্রমাণের অভাবে। মাসুদ রানা জানে, ফিলবিই হোয়াইটহল থেকে চুরি করেছে ডকুমেন্টগুলো। কিন্তু জানা আর কোর্টে তা প্রমাণ করা এক নয়। তাছাড়া কোর্টে মামলা উঠলেই জেনে যাবে প্রেস।

জানাজানি হয়ে যাবে সব। কিন্তু মাসুদ রানা তা হতে দিতে চায় না। ভয় দেখিয়ে গোপনে মুখ খোলাতে হবে রবার্ট ফিলবিকে। জানতে হবে কতদিন থেকে এ কাজ করছে সে। কাকে দিচ্ছে বা কোথায় পাঠিয়েছে চুরি করা ডকুমেন্ট, ন্যাটোর কতটা ক্ষতি এরইমধ্যে হয়ে গেছে। তারপর বিশেষ এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই বানচাল হয়ে যাবে ওর সাজানো ছক্।

'ওয়েল,' মুখ খুললেন রবার্ট ফিলবি। 'সবইতো জেনে গেছেন, আ…বলুন, আর কি জানতে চান।'

গোপনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রানা। আসন নেয়ার পরপরই কোটের ডান পকেটে রাখা মিনিয়েচার টেপ রেকর্ডারটির বোতাম টিপে দিয়েছিল ও। লোকটার স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে কিনা ভেবে এতক্ষণ খুব টেনশনে ছিল।

কেটে গেছে তা। 'কতদিন ধরে এসব গোপনীয় দলিলপত্র চুরি করছেন আপনি হোয়াইটহল থেকে?'

'এক বছরের কিছু বেশি হবে।'

'কেন করছেন। আই মীন, কাদের সরবরাহ করছেন আপনি এসব তথ্য?'

'সাউথ আফ্রিকানদের।'

'সাউথ আফ্রিকা!' আকাশ থেকে পড়ল মাসুদ রানা। 'সাউথ আফ্রিকা? ওরা কি করবে এসব দিয়ে?'

'ওদের বর্জন করে, একঘরে করে চরম বোকামি করেছে পশ্চিমা দেশগুলো। আহাম্মকের মত কাজ করেছে। চরম এক অনিশ্চয়তার মধ্যে, নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে প্রিটোরিয়াকে। ন্যাটো আর ওয়ারশ জোটের মধ্যে যদি কোনদিন বেধে যায় লড়াই, ওদের ছেড়ে কথা কইবে না কেউ, আই মীন, স্ট্র্যাটেজিক্যালি সাউথ আফ্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। আপনি নিশ্চই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ভুলে যাননি। সে যুদ্ধের মূল রণাঙ্গনই বলতে গেলে ছিল সাউথ আফ্রিকা এবং সাহারার দক্ষিণাংশ। কিন্তু আর যাতে সেরকম পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, সে জন্যে প্রিটোরিয়াও ন্যাটোর কন্টিঞ্জেন্সি প্ল্যানের অনুকরণে নিজেদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। ডকুমেন্টগুলো ওদের অনেক কাজে লাগবে বলে ওরা আমার সাহায্য চেয়েছিল।'

'এবং ওদের সাহায্য করা আপনি প্রয়োজন মনে করেছেন,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ।'

'অফিশিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

'যে উদ্দেশে আপনি ওদের সাহায্য করেছেন, ঠিক সেইমত কাজ প্রিটোরিয়া করেছে বা করছে কিনা, সে ব্যাপারে জানেন কিছু?'

'না।'

'না কেন, খোঁজ নেননি?'

'না।'

তাজ্জব হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার মুখ থেকে এসব কথা বেরোচ্ছে, কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

'বেশ। এবার বলুন, কার মাধ্যমে ওদেশে ডকুমেন্টস্ পাঠিয়ে আসছেন আপনি।'

'ডি অ্যাঙ্গাস। এখানকার সাউথ আফ্রিকান এমব্যাসির একজন ডিপ্লোম্যাট।'

'তথ্য পাচারের অনুরোধ প্রথমে কার কাছ থেকে পান আপনি, সরাসরি ওদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে, নাকি অ্যাঙ্গাসের কাছ থেকে?'

'অ্যাঙ্গাসের কাছ থেকে। সে আসলে এনআইএস রেসিডেন্ট।'

'এর সঙ্গে আপনার পরিচয় কখন কিভাবে হয়? আপনি যখন প্রিটোরিয়ায় পোস্টেড ছিলেন, তখন?'

মুখ তুললেন ফিলবি। 'আপনি জানেন কিভাবে?'

'আমাদের জানতে হয়। বলে যান, প্লীজ।' এখানে আসার আগে রবার্ট ফিলবির সার্ভিস রেকর্ড ফাইল ঘেঁটে এসেছে রানা হোয়াইটহলের রেকর্ড সেকশন চীফের সাহায্যে। ও নিজে, স্যার মারভিন লংফেলো এবং সেকশন চীফ ছাড়া আর কেউ জানে না ব্যাপারটা। ওতেই পেয়েছে রানা, প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারি হিসেবে বছর আড়াই ওদেশে ছিলেন ফিলবি।

'হ্যাঁ।'

'লোকটা সত্যিই এনআইএসের কি না, তাও নিশ্চই জানেন না আপনি, আই মীন, ফর শিওর?'

দ্বিধাগ্রস্তের মত মাথা দোলালেন তিনি। 'না, জানি না।' চেহারা দেখে মনে হলো একটু যেন থতমতও খেয়ে গেছেন। হয়তো ভাবছেন, এ প্রশ্নটা মনে জাগেনি কেন তাঁর এতদিন?

'ডি অ্যাঙ্গাসের সঙ্গে দেখা হয় প্রায়ই?' চোখ বুজে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। মাথায় অন্য লাইনের চিন্তা ঢুকেছে।

'কখনও কখনও। তবে খুব কম।'

'এই ডকুমেন্টগুলো কবে হস্তান্তর করেছেন তার কাছে?'

'মাস দুয়েক আগে।'

'ঠিক আছে। এবার মন দিয়ে শুনুন। লোকটার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখবেন আপনি আরও কিছুদিন।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ফিলবির। 'কি...?'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে সামনাসামনি হবেন না। কারণ আপনার মুখ দেখলেই সে অনুমান করে নেবে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সাবধান! খুব সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে এ ব্যাপারে। কোনমতেই যেন কিছু আঁচ করতে না পারে ডি অ্যাঙ্গাস। মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে অন্য আর যেভাবে পারেন, টেলিফোন বা আর কোন মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন, আপাতত। নিয়মিত অফিসে যাবেন। এতদিন যা যা করেছেন, ঠিক তাই করে যাবেন। এরপর আরেকটা কাজ করতে হবে আপনাকে।'

'কি কাজ?' আগ্রহের আতিশয্যে আধ ফুট এগিয়ে এলেন ফিলবি।

'সময় হলে জানবেন। মনে রাখবেন, যদি শেষ পর্যন্ত আমার কথামত চলেন, বেঁচে যাবেন আপনি। নইলে...।' কথা শেষ না করেই থেমে গেল

মাসুদ রানা। চট্‌ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাগজগুলো আগেই ভরে রেখেছে ব্রিফকেসে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা। 'চললাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইলেন রবার্ট ফিলবি। কিন্তু সুযোগ দিল না ও। দেখেও না দেখার ভান করে বেরিয়ে এল দ্রুত পায়ে।

উসভো। প্রেসিডেন্টের দাচায় সমবেত হয়েছেন অ্যালবিয়ন কমিটির চার সদস্য। চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছে কমিটি। দাচার অবিশ্বাস্য রকম বড় এবং চোখ ধাঁধানো বিলাসের ছড়াছড়িতে ভরা সীটিংরুমে প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি বসেছেন সবাই। আজ আর বডিগার্ড নেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। কেবল মেজর কিরলভকে নিয়ে অত্যন্ত গোপনে মস্কো ত্যাগ করেছেন তিনি প্রয়োজন নেই বলে। দাচার গার্ড সংখ্যা প্রেসিডেন্ট মস্কো ত্যাগ করার কয়েক ঘণ্টা আগেই চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সঙ্গে ডজনখানেক ডগ হ্যাণ্ডলারও রয়েছে।

চার মণ ওজনের বিশালবপু ড. জোসেফ পাভলভ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকেই কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করেছেন অন্য তিন সদস্য। বলতে লাগলেন তিনি, 'মাননীয় কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা অত্যন্ত সুচতুর, নিশ্ছিদ্র এক নাশকতামূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছি। আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের বন্ধু, কমরেড জেনারেল মার্চেঙ্কোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে জিআরইউ পরিচালিত সর্বশেষ জনমত জরীপে দেখা গেছে, কনজারভেটিভরা লেবারদের চেয়ে প্রায় পনেরো শতাংশ এগিয়ে রয়েছে। পনেরো শতাংশ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। এর তিন শতাংশ এদিক-ওদিক হবে ধরেই নিয়েছি আমরা। ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের পড়ন্ত জনপ্রিয়তা হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে, ফলে

ব্যবধান যেরকম হবে বলে আশা করা হয়েছিল, তেমনটি হয়নি।

'সে যাই হোক, আমাদের এই পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তাহলে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, শতকরা আশিভাগ ভোট পড়বে লেবার পার্টির পক্ষে। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই পরিকল্পনার নাম দিয়েছি আমরা প্ল্যান অরোরা।'

একে একে বাকি তিনজনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল জেনারেল সেক্রেটারির নীল বাজপাখির দৃষ্টি। তারপর ড. পাভলভের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির ভঙ্গি করলেন তিনি। 'এবার তাহলে শোনা যাক আপনাদের প্ল্যান আরোরার বক্তব্য।'

'নিশ্চয়ই। কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

টাইপ করা প্ল্যান পড়তে শুরু করলেন ড. পাভলভ। এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে সাজানো হয়েছে ওতে যে ছোটখাট একটা বই-ই হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। মাঝে মাঝে চোখ তুলছেন প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না দেখার জন্যে। কিন্তু তাঁর থেকে অনেক অনেক বড় খেলার গ্র্যাণ্ড মাস্টার প্রেসিডেন্ট। বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়ার আভাসও বোঝা গেল না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা টানা বলে যাওয়ার পর থামলেন ড. পাভলভ। পড়া শেষ। অখণ্ড নীরবতা নেমে এল ঘরে। এক সময় মুখ খুললেন প্রেসিডেন্ট। 'এতে প্রচুর ঝুঁকি আছে। কি নিশ্চয়তা আছে যে আগের...অন্যান্য পরিকল্পনার মত এটাও ব্যর্থ হবে না?'

কোন পরিকল্পনার কথা বোঝাতে চাইছেন তিনি, প্রকাশ না করলেও অন্যরা বুঝে নিলেন। বছর তিনেক আগে সুইডেনে এক নাশকতামূলক প্রকল্পে হাত দিয়ে ফেঁসে গিয়েছিল কেজিবি। প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয়

সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে। প্রায় এক বছর লেগেছিল মস্কোর সে গেরো থেকে বেরতে। যদিও, এখনও মাঝেমধ্যে তা নিয়ে সুযোগ পেলেই খোঁচাতে ছাড়ে না পশ্চিমা মিডিয়া।

'উইথ অল রেসপেক্ট, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি, পুরো নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, ওটার সঙ্গে প্ল্যান অরোরার কোন তুলনাই চলে না। এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের, ব্যতিক্রমি। এর প্রতিটি বাঁকে বাঁকে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে ফল ব্যাক, কাটআউট। যে এর নির্বাহী অপারেটর হবে, তাকে হতে হবে টপ্ প্রফেশনাল। দেশের স্বার্থে বিনা প্রশ্নে নিবেদিতপ্রাণ। কোথাও কোন গণ্ডগোল যদি এত সাবধানতার পরও ঘটেই যায়, ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করতে হবে তাকে। এবং মৃত্যুর পর তাকে কেউ যেন সোভিয়েত স্পাই বলে সনাক্ত করতে না পারে, সেদিক থেকেও তাকে উপযুক্ত হতে হবে। খুঁজলে এমন লোক সংগ্রহ করা কঠিন হবে বলে আমি মনে করি না, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। যদিও,' থেমে নাক চুলকালেন ড. পাভলভ। 'প্ল্যান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে তারও মৃত্যু হবে, প্ল্যানেরই অংশ হিসেবে। অরোরায় কোন রকম লুজ এণ্ড রাখেনি অ্যালবিয়ন কমিটি।

'এর পরপরই আমাদের সাব-প্ল্যানের কাজ শুরু হবে। বিশ্ববাসীকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করানোর ব্যবস্থা করা হবে যে মস্কো নয়, এজন্যে দায়ী ওয়াশিংটন।'

মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন প্রেসিডেন্ট। দু মিনিট পর মুখ তুললেন। অন্য তিনজনের মতামত চাইলেন তিনি। 'প্ল্যান অরোরা কার্যকর করা সম্ভব?'

বিনা দ্বিধায় সম্মতি জানালেন সবাই। 'সম্ভব।'

ওঁদের সামনের গ্লাস টপ্ কফি টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে থাকা এক গাদা

ফাইল, ফোল্ডার দেখলেন প্রেসিডেন্ট। প্ল্যান আরোরার খসড়া এবং মূল পরিকল্পনা। মুখ তুলে সেদিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'প্ল্যানের সব খুঁটিনাটি এখানে আছে?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি,' বললেন জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো।

'এর বাইরে আর কিছুই নেই, টেপ রেকর্ডার বা ফেলে দেয়া কাগজ যাতে এসবের আর কোন তথ্য বা টুকিটাকি লেখা আছে, বেখেয়ালে ফেলে দিয়েছেন কেউ?'

'কিচ্ছু নেই,' জোর দিয়ে বললেন চার কমিটি সদস্য।

'সব রেখে যান আপনারা। ড. পাভলভ বাদে আর সবাই কাল থেকে যার যার স্বাভাবিক কাজে লেগে পড়ুন। ভুলে যান অ্যালবিয়ন কমিটি, প্ল্যান অরোরার কথা। গুড বাই, কমরেডস্।'

আসন ছাড়লেন বাকি তিনজন। দরজার কাছের ক্লোক কাবার্ড থেকে যার যার গ্রেটকোট বের করে পরে নিলেন। মাথায় চাপালেন শাপকা। কেউ কারও চোখের দিকে তাকাচ্ছেন না। মিনিট তিনেক পর সামনের কোর্ট ইয়ার্ডে এক এক করে তিনটে চইকা লিমুজিন স্টার্ট নিল। নাক ঘুরিয়ে সার বেঁধে রওনা হলো বুলেভার্ডের দিকে। সামনের বার্চ আর পাইনের বন আলোকিত হয়ে উঠল তিন জোড়া শক্তিশালী হেডলাইটের আলোয়।

ভেতরে তেমনি বসে আছেন জেনারেল সেক্রেটারি। উপস্থিত আরেকজনের অস্তিত্ব ভুলে গেছেন যেন। অনেক, অনেকক্ষণ পর চোখে পলক পড়ল তাঁর দীর্ঘ সময় নিয়ে। এমন বেপরোয়া বিপজ্জনক এক প্ল্যান তৈরি করবে অ্যালবিয়ন, স্বপ্নেও কল্পনা করেননি তিনি। ঝুঁকি আছে, তেমনি সফল হওয়ার সম্ভবনাও ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেললেন তিনি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে হাত দিতে হবে। নির্বাচনের আর এক মাসও বাকি নেই।

'ড. পাভলভ, কাছে আসুন।'

রাগে কাঁপছেন স্যার মারভিন লংফেলো। 'এনআইএস?' চোখ গরম করে মাসুদ রানার দিকে চেয়ে আছেন, যেন সব দোষ ওর। 'এনআইএস ভর করেছে ফিলবির মত এক টপ্ ক্লাস অফিসারের কাঁধে?' বাঘের দৃষ্টিতে সামনে রাখা টেপ রেকর্ডারটির দিকে তাকালেন এবার লংফেলো। পরক্ষণেই করুণ হয়ে উঠল চেহারা। বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'ওহ্, মাই ল-অ-র্ড!'

এনআইএসের সঙ্গে খুব একটা অন্তরঙ্গতা নেই বিএসএসের, জানে মাসুদ রানা। যেটুকু আছে কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বার্থেই। জোহান্সবার্গে বিএসএসের একজন হেড অভ স্টেশন আছে। প্রিটোরিয়ার অনুমতি আছে তাতে। তেমনি লণ্ডনেও এনআইএসের একজন হেড অভ স্টেশন আছে, জানে বিএসএস। কিন্তু সে ডি অ্যাঙ্গাস নয়। ওটাই বৃদ্ধের রাগের কারণ। সে যদি সত্যিই এনআইএসের হয়ে থাকে, তাহলে হবে দু' নম্বর, বা তিন নম্বর, বা আল্লা মালুম কত নম্বর।

তার মানে চুক্তি ভঙ্গ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। চুক্তিতে উভয় দেশের একজন করে হেড অভ স্টেশন বিনিময়ের কথা থাকলেও তার প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে প্রিটোরিয়া। ভদ্রলোককে ঘন ঘন বুড়ো আঙুলের নখ দাঁতে খুঁটতে দেখে বলল রানা, 'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন, স্যার। মাথা গরম করে লাভ হবে না।'

'এতকিছুর পরও কি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখি, বলো?'

'ওদের চীফ, জেনারেল ডিয়েটার গেরহার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা

করুন। অ্যাঙ্গাস সত্যিই ওদের লোক কি না জানতে হবে আগে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন বৃদ্ধ। 'একটা বুদ্ধি দাও। যে-পথে এগোলে দ্রুত কাজ উদ্ধার করা যাবে।'

লণ্ডনের নির্দেশে জোহান্সবার্গের বিএসএস প্রতিনিধি পরদিন প্রিটোরিয়া গিয়ে দেখা করল জেনারেল গেরহার্ডের সঙ্গে। এবং জেনারেলের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল সেদিনই লণ্ডনে রিপোর্ট করল সে।

'জেনারেল বাইবেলের শপথ করে বলেছেন, ডি অ্যাঙ্গাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি,' বললেন লংফেলো। 'এ নামে কেউ নেই এনআইএসে। ছিলও না কোনকালে,' বলেই দুম্ করে ঘুসি মেরে বসলেন টেবিলে। 'আমি বিশ্বাস করি না! মিছে কথা বলছে লোকটা!'

'মনে হয় না,' শান্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। লোকটা যদি সত্যিই তাঁর সংস্থার হত, তাহলে বিএসএসের হাতে ধরা পড়ার আগেই তাকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতেন তিনি। অন্তত গতকাল বিএসএস প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু জেনারেল তা করেননি। এখনও বহাল তবিয়তে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডি অ্যাঙ্গাস।'

সাত

কেজিবির হেড অফিস মস্কো কেন্দ্রের দুই নম্বর দযেরঝিনস্কি স্কয়ারে হলেও এর বিভিন্ন ডিরেক্টরেট ছড়িয়ে আছে সারা শহরময়। ওখানে স্থানাভাবের কারণে। শহর বেষ্টন করা আউটার রিঙ রোড ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে, ইয়াসিনেভোয় তার এক শাখা; ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের হেড অফিস।

ভবনটি সাততলা। অ্যালুমিনিয়াম আর পুরু টিনটেড গ্লাস মোড়া ভবনটির সঙ্গে ইঁট-সিমেন্টের কোন সংশ্রব আছে দেখলে মনেই হয় না। ডিজাইন সর্বাধুনিক । ওর মাথায় শোভা পাচ্ছে বড় চকচকে এক স্টীলের বৃত্তের মাঝে তিন কোনা বিশিষ্ট নক্ষত্র। অনেকটা মার্সিডিজ গাড়ির লোগোর মত। এফসিডির প্রতীক ওই নক্ষত্র। শহরের বাইরে বলে সুবিধেই হয়েছে, এফসিডির, অন্যদের মত তাদের ওপর সারাক্ষণ নজরদারি করতে পারে না পশ্চিমা চোখ, বিশেষ করে সিআইএ।

গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেট শীর্ষে। বাইরে তো বটেই, দেশের ভেতরেও ছদ্ম পরিচয়ে থাকে এর অপারেটররা। বিদেশে যারা আছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই 'কূটনীতিক'। এফসিডির অধীনে আরেক ডিরেক্টরেট, 'এস' বা ইল্‌লিগ্যালস্‌ ডিরেক্টরেট। এফসিডি যদি সিক্রেট হয়, তো 'এস' টপ্‌ সিক্রেট। ডিরেক্টরেটের অন্য সব শাখার সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাক, ওরা নিজেরা নিজেরা পর্যন্ত মুখোমুখি হয় না কখনও।

এদের ট্রেনিঙ এবং ব্রিফিঙ হয় ওয়ান-টু-ওয়ান, কেবলমাত্র গুরু এবং শিষ্য পদ্ধতিতে। এরা অন্যদের মত নিয়মিত হাজিরা দেয় না অফিসে, কারণ তাতে মুখ চেনাচিনি হয়ে যাবে। ইল্লিগ্যালস্দের মধ্যে পুরুষ যেমন আছে, তেমনি মেয়েও আছে। এরা হাইলি ট্রেইনড্। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই আছে এরা 'ডীপ কাভার' এজেন্ট হিসেবে।

এত যাদের সতর্কতা, গোপনীয়তা, তাদের প্রধান কিন্তু এই ভবনে বসেন না। বসেন দুই দযেরঝিনস্কি স্কয়ারে। কারণ তাতে 'সহকর্মীদের' সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সুবিধে। পঁয়ষট্টি প্রায় ছাড়িয়ে গেছে ভদ্রলোকের বয়স। মেজর জেনারেল ভ্লাদিমির চেরনোভস্কি। জীবনের চারভাগের তিনভাগই কেটেছে তাঁর বিদেশে বিদেশে, ডীপ কাভার এজেন্ট হিসেবে।

অ্যালবিয়ন কমিটি তাদের 'প্ল্যান অরোরা' ঘোষণা করার দুদিন পরের ঘটনা। দুপুরের দিকে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন জেনারেল আয়েশ করে, অপরিচিত দুই ব্যক্তি ঢুকল ভেতরে। তাদের একজন একটা চিঠি এগিয়ে দিল। পড়লেন ওটা চেরনোভস্কি। মেজাজ খিঁচড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যদিও ভাবটা সযত্নে গোপন করে গেলেন। নিচু গলায় বললেন, 'আপনারা যেমন চাইছেন, তেমন একজনই মাত্র আছে আমার অধীনে। কিন্তু হাতের কাছে নেই সে। দূরে আছে।'

'তাহলে, কমরেড মেজর জেনারেল,' চিঠি হস্তান্তরকারী লোকটি বলল। 'আজই ওকে ডিটাচ করুন। এবং এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলুন,' সেন্ট্রাল কমিটির একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল সে 'এস' প্রধানের দিকে।

আগন্তুক দু'জন বিদেয় নিতে আরেকবার চিঠিটা পড়লেন মেজর জেনারেল। চোখ বোলালেন কার্ডটির ওপরও। তারপর মাথা দোলালেন। কিচ্ছু করার নেই। যাঁর কাছ থেকে এসেছে এই চিঠি এবং কার্ড, তাঁর

সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রশ্নই আসে না। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন চেরনোভস্কি। সেরা মানুষটিকে হাতছাড়া করতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কি আর করা, উপায় নেই। ছাড়তেই হচ্ছে।

বাঁ হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন তিনি। 'মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে বলো আমার অফিসে রিপোর্ট করতে।'

দাচার বিশাল সীটিংরূমে যখন নিয়ে আসা হলো তাকে, রীতিমত কাঁপুনি উঠে গেছে মেজর তাতায়েভের। ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে। জীবনে কখনও সামনাসামনি হয়নি সে প্রেসিডেন্টের, হবে বলে স্বপ্নেও ভাবেনি। ভয়ে ভয়ে আছে বেশ। গত তিনটে দিন বড্ডো আতঙ্কে কেটেছে তার।

স্পেশাল ডিউটি থেকে সরিয়ে এনে সেন্ট্রাল মস্কোর এক ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে তাকে এ ক'দিন। নাইনথ্ ডিরেক্টরেটের দু'জন করে গার্ড সরাক্ষণ পাহারা দিয়েছে সে ফ্ল্যাট। প্রথম প্রথম ভেবেছে তাতায়েভ, না জানি কী মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছে সে অজান্তে। কিন্তু সেটা যে কি ভেবে পায়নি প্রচুর মাথা খাটিয়েও।

তারপর, হঠাৎ করেই নির্দেশ এল গোসল-শেভ সেরে নিজের সেরা সিভিলিয়ান স্যুটটি পরে তৈরি হয়ে নেয়ার। নিচে গাড়ি অপেক্ষা করছে, দূরে কোথাও যেতে হবে। দাচার সীটিংরূমে ঢোকার সময়ই কেবল জানতে পেরেছে ভ্যালেরি তাতায়েভ, কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি শুরু হয়েছে সর্বাঙ্গে। জিভ শুকিয়ে কাঠ। নিজেকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে চালাতে ভাবল মেজর, প্রেসিডেন্টের যে কোন অভিযোগের সদুত্তর দিতে প্রস্তুত সে। কোন অন্যায় সে করেনি। কাজেই তার ভয় পাওয়ারও কিছু নেই।

কিন্তু ভেতর থেকে প্রেসিডেন্টকে বেরিয়ে আসতে দেখেই সব

সৎসাহস উবে গেল মেজরের। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন হয়ে গেল সে। নীরবে তার সামনের এক সোফায় এসে বসলেন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকলেন সুদর্শন, সুঠাম তাতায়েভের দিকে। তারপর হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন তাকে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে গুণে গুণে চার কদম এগোল মেজর মার্চ করে। দাঁড়িয়ে পড়ল।

যখন মুখ খুললেন প্রেসিডেন্ট, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না সে। 'মেজর তাতায়েভ, তুমি কোন টেইলরের ডামি নও। তাহলে কেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাছে এসো, বোসো আমার মুখোমুখি।'

প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ভ্যালেরি। প্রেসিডেন্টের সামনে কোন মেজর কোন কালে আসন গ্রহণ করেছে, বাপের জন্মেও শোনেনি সে। সামান্য দ্বিধায় ভুগল মেজর, তবে নির্দেশ পালন করতে দেরি করল না। সামনের একটা চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে পড়ল। দু হাঁটু সেঁটে থাকল পরস্পরের সঙ্গে। চোখ তুলতে পারল না সে চেষ্টা করেও।

'তোমাকে কেন ডাকিয়ে এনেছি এখানে জানো, মেজর?'

'না, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

'বলছি। শোনো। বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশন পরিচালনার দায়িত্ব তোমাকে দেব আমি ঠিক করেছি। দেশের স্বার্থে পরিচালিত হবে সে মিশন। যদি সফল হতে পারো, প্রচুর লাভ হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের। আর যদি বিফল হও, ক্ষতি হবে অকল্পনীয়। এ কাজে একমাত্র তোমাকেই আমার উপযুক্ত মনে হয়েছে, মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ।'

মাথার ভেতর সব গড়বড় হয়ে গেল তার। তোলপাড় চলছে বুকের মধ্যে। এসব কি সত্যি শুনছে সে? প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে ঠিক এই কথাগুলোই বেরিয়েছে? শুনতে ভুল হয়নি তো তাতায়েভের? কোথায়

ধরেই নিয়েছিল অজানা কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে তাকে। মাত্রা বুঝে র‍্যাঙ্ক কেড়ে নেয়া অথবা সাইবেরিয়া বা উরালের কোন 'চরিত্র সংশোধনাগারে' পাঠানো হবে, তার বদলে কি না…।

আনন্দে চোখে পানি এসে যাওয়ার জোগাড় ভ্যালেরি তাতায়েভের। মস্কো ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট স্কলার ছিল সে। ছোটবেলা থেকে মনে গেঁথে বসেছিল দেশসেবার বাসনা। চাকরিতে ঢুকেছে আট বছর। সেই প্রথম থেকেই অপেক্ষা করে আছে সে বিদেশে সত্যিকার এক মিশন নামের এই সোনার হরিণটির সন্ধানে। যদি কান বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে, যদি এসব কমরেড প্রেসিডেন্টের কোন নির্মম রসিকতা না হয়ে থাকে, তাহলে…।

মুখ তুলল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। সরাসরি তাকাল প্রজাতন্ত্রের প্রধানের নীল চোখের দিকে। মৃদু, কাঁপা গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

'অন্যরা তোমাকে মিশনের বিস্তারিত ব্রিফ করবে। সময় খুব একটা নেই হাতে। জানি তুমি সর্বোচ্চ ট্রেনিঙের চূড়ান্ত শিখর অতিক্রম করেছ সফলতার সঙ্গে। তাই তোমাকেই বেছে নিয়েছি আমি। যদি সফল হতে পারো, আমার বিশ্বাস পারবে, যে সম্মান আর প্রমোশন অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে,' মৃদু হাসি ফুটল পার্টি প্রধানের, 'তা তোমার কল্পনারও অতীত। আমি নিজে দেখব ব্যাপারটা।

'তবে, যদি কোথাও কোন ভুল হয়ে যায়, গণ্ডগোল হয়ে যায়, মানে, তোমার পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে ধরা দেয়া চলবে না। এর সঙ্গে তোমার মাতৃভূমির মান-ইজ্জত জড়িত, কথাটা মনে রেখো। ওরা যেন জীবিত মেজর তাতায়েভকে ধরতে না পারে। বুঝতে পারছ, মেজর, ঠিক কি বলতে চাইছি আমি?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। বুঝতে পারছি।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'ধরতে পারলে ওরা তোমার মুখ খোলাবে। নির্যাতন করেই হোক বা কেমিক্যাল প্রয়োগ করেই হোক, খোলাবেই। মানবদেহে এমন কোন প্রতিরোধক নেই যা কেমিক্যালের শব্দহীন নির্যাতন ঠেকাতে পারে। যদি ধরা পড়ো, সোভিয়েত ইউনিয়নের যে অকল্পনীয় ক্ষতি হবে তা কোনদিন পূরণ হবে না।'

লম্বা করে শ্বাস টানল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। 'আমি ব্যর্থ হব না,' দৃঢ় আস্থার সুর ফুটল তার কণ্ঠে, 'কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। তারপরও যদি দুর্ভাগ্যবশত তেমন সময় আসেই, ওরা আমাকে জীবিত পাবে না।'

'গুড!' বাযার টিপলেন প্রেসিডেন্ট টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে। দরজা খুলে গেল। বাইরে পাথরমুখো মেজর কিরলভ দাঁড়িয়ে।

'যাও তাহলে, ইয়াংম্যান,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এখানেই ব্রিফ করা হবে তোমাকে, এক্ষুণি। এরপর আর কোথাও দেয়া হবে ইনটেনসিভ ব্রিফিং। গুড বাই, কমরেড মেজর। উইশ ইউ ভেরি বেস্ট অভ লাক। তুমি সফল হয়ে ফিরে এলে আমাদের আবার দেখা হবে।'

তাতায়েভের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ভারি দরজা। দীর্ঘ সময় পর চোখে পলক পড়ল গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড মাস্টারের।

সকাল সাড়ে দশটায় প্রিটোরিয়ার জান স্মুটস্ এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বৃহদাকার এয়ারবাস। ভিড় খানিকটা পাতলা হতে ধীরেসুস্থে নেমে এল মাসুদ রানা। দুজন এনআইএস ফিল্ড এজেন্ট অবজার্ভেশন টাওয়ার থেকে লক্ষ রাখল রানার ওপর। তবে কাছে আসার চেষ্টা করল না। ওরা কেবল জানে মাসুদ রানা আসছে। কেন, জানে না।

ত্রিশ মিনিট ব্যয় হলো কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ব্যারিয়ার পার হতে।

তারপর ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলো রানা। আফ্রিকা সম্পর্কে যাদের তেমন পরিচয় নেই, এ দেশে এলে হোঁচট খাবে তাদের অনুমান-নির্ভর ধারণা। প্রশস্ত ছয় লেনের কুচকুচে কালো কার্পেটিঙ করা আধুনিক হাইওয়ে ধরে ছুটছে ওর ট্যাক্সি। অবাক বিস্ময়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে মাসুদ রানা। বিশ্বাস হতে চায় না, কোন আফ্রিকান দেশ এত আধুনিক হতে পারে।

সেন্ট্রাল প্রিটোরিয়ার ভ্যান ডের ওয়াল্ট স্ট্রীটের বিলাসবহুল পাঁচ তারা হোটেল বার্গারস্পার্কে স্যুইট বুক করা আছে মাসুদ রানার নামে। সময় আছে দেখে হোটেলেই উঠল ও প্রথম। শাওয়ার শেভ সেরে তখনই বেরিয়ে পড়ল আবার। ঠিক এগারোটায় এনআইএস চীফ জেনারেল ডিয়েটার গেরহার্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এগারোটা বিশে কার্ক স্ট্রাটের দীর্ঘ, তিনতলা কফি রঙা এনআইএস হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছল মাসুদ রানা।

ছোটখাট একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণমুখো ভবনটি। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলো ও। তিনতলার একদম পশ্চিম প্রান্তে জেনারেলের অফিস। নিচতলায় রিসেপশনে ওরই জন্যে অপেক্ষমাণ এক তরুণ এনআইএস এজেন্ট রিসিভ করল রানাকে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে। দু'-চার কথায় শুভেচ্ছা বিনিময় করল দু'জন, লিফটে করে উঠে এল তিনতলায়।

জেনারেল গেরহার্ড বিশালদেহী। প্রায় সাড়ে ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা। বয়স ষাটের মত। শক্তপোক্ত গড়ন। উঠে এসে হাত মেলালেন তিনি রানার সঙ্গে। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম, মেজর মাসুদ রানা।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।' অফিস রুমটা বেশ বড়, তবে অনাড়ম্বর। দেয়ালে ঝুলছে অনেকগুলো ম্যাপ, অপারেশনাল। ঘরের এক প্রান্তে দরজার দিকে মুখ করা বিশাল এক গ্লাস টপ্ সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এপাশে কোন

চেয়ার নেই ওটার। আরেক মাথায়, জানালার কাছে একটা নিচু টেবিল। চারটে ক্লাব চেয়ার রয়েছে ওটা ঘিরে। ওখানেই বসালেন জেনারেল মাসুদ রানাকে।

'আপনি পৌঁছার খানিক আগেই কথা হয়েছে আমার রাহাতের সঙ্গে,' হাসি মুখে ওর দিকে চেয়ে আছেন গেরহার্ড। 'আপনি জানেন, রাহাত আর আমি এক সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম? জেনারেল রোমেলের প্যান্‌জার ডিভিশনের বিরুদ্ধে তবরুক ফ্রন্টে লড়েছিলাম আমরা। ও আর আমি দু'জনেই মেজর ছিলাম তখন, একই ইউনিটের।'

'জ্বি, স্যার। শুনেছি।'

'রাহাতের মত দুর্দান্ত সাহসী আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি। ওর যোগ্য পরিচালনার ফলেই বিসিআইয়ের এত সুনাম আজ। অবশ্য, তার পিছনে আপনার ভূমিকাও কম নয়।'

'আপনি বাড়িয়ে বলছেন, জেনারেল।'

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরহার্ড। 'মোটেই না, মোটেই না।'

আরও মিনিট পাঁচেক হালকা আলোচনা চলল দু'জনের। বেশিরভাগ কথা জেনারেলই বলছেন। রানা বুঝল, মানুষটি গল্পবাজ, বেশি সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। কাজেই সময় বুঝে আলতো করে ওর আসার কারণ সম্পর্কে সামান্য আভাস দিল রানা। ব্যস্, ওতেই কাজ হলো। মুহূর্তে কাজের মানুষ বনে গেলেন জেনারেল।

'তো, মেজর মাসুদ রানা, কাল টেলিফোনে আমাদের আলোচনার সময় আপনি বলেছেন, ডি অ্যাঙ্গাস কার বা কাদের হয়ে কাজ করে জানতে চান আপনি, ঠিক?'

'রাইট, জেনারেল।'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলালেন তিনি কয়েকবার। 'লংফেলো এবং আপনাকে তো বটেই, রাহাতকেও আমি কথা দিয়েছি এ জন্যে যতদূর

আমার পক্ষে সম্ভব, করব। তবে ও আমাদের লোক নয়। ছিলও না কোনদিন। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'আমার একজন পার্সোন্যাল স্টাফ অফিসারকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, যে-কোন কাজেই ও আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। ফাইল পরীক্ষা করা, ইন্টারপ্রিট করা, এসবে আপনার ওকে লাগবে। আমাদের ভাষা জানেন?'

'না, জেনারেল।'

'অসুবিধে নেই। ছেলেটা বেশ চটপটে, ওকে দিয়েই দোভাষীর কাজ চালিয়ে নেবেন।'

ইন্টারকমে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিলেন ডিয়েটার গেরহার্ড। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল রানারই বয়সী এক যুবক। আদা রঙের চুল। গোঁফও একই রঙের। মুখটা লম্বাটে। রানার উদ্দেশে সামান্য নড করল সে।

'পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। অ্যানডি, ইনি মেজর মাসুদ রানা। যার কথা তোমাকে কাল বলেছি। এখন থেকে এঁর সঙ্গে থাকবে তুমি। যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়।'

হাত মেলাল রানা আর অ্যানড্রিয়াস। সম্ভবত পরীক্ষা করার জন্যেই প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটাতে গেল আফ্রিকান, কিন্তু রানার পাল্টা চাপ খেয়ে ঢিল দিল মুঠোয়।

'আপনার সুবিধের জন্যে এই ফ্লোরেই একটা রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে বসে শুরু করুন কাজ,' বললেন গেরহার্ড।

জেনারেলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা দুজন। দীর্ঘ করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় রানার নির্ধারিত রুম। ভেতরটা বেশ

সাজানো-গোছানো। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। 'বলুন, মেজর, ঠিক কোনখান থেকে শুরু করতে চান কাজ।'

'ডি অ্যাঙ্গাসের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে, ক্যাপ্টেন।'

'ঠিক।' ড্রয়ার থেকে একটা প্যাকেট মোড়া পুরু ফাইল বের করল পিয়েনার। 'বসের নির্দেশে আজই ফরেন মিনিস্ট্রির পার্সোন্যাল রেজিস্ট্রি থেকে এটা নিয়ে এসেছি আমি।' মাসুদ রানার সামনে রাখল সে ফাইলটা প্যাকেট থেকে বের করে। 'পুরো ফাইলটা পড়েছি আমি। সংক্ষেপে বলতে পারি, যদি তাতে আপনার কিছুটা সাহায্য হয়।'

'প্লীজ, ক্যাপ্টেন।'

'১৯৪৬ সালে কেপটাউনে সাউথ আফ্রিকান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন ডি অ্যাঙ্গাস। চল্লিশ বছরের কিছু বেশি হয়েছে তাঁর চাকরির বয়স, আগামী ডিসেম্বরে রিটায়ার করার কথা। ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ নেই, ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডেও কোন খুঁত নেই। পা'ফেক্ট সাউথ আফ্রিকানার।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অ্যানড্রিয়াসকেও অফার করল। তারপর মোড়ক ওল্টাল ফাইলটার। প্রথমেই ইংরেজিতে হাতে লেখা কয়েকটা শীট।

'ডি অ্যাঙ্গাসের নিজহাতে লেখা অটোবায়োগ্রাফি ওটা। ফরেন সার্ভিসের সবাইকেই সাবমিট করতে হয় নিজের পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত। জান স্মুটের ইউনাইটেড পার্টি ছিল তখন ক্ষমতায়, আফ্রিকান ভাষার বদলে সে সময় লেখালেখির ব্যাপারে ইংরেজি ব্যবহার হত অফিস-আদালতে। এখন অবশ্য হয় না।'

'ভালই,' বলল মাসুদ রানা। 'সুবিধেই হলো আমার। আমি পড়ে দেখি এগুলো, এই ফাঁকে আপনি দয়া করে লোকটির দেশ-বিদেশে পোস্টিং আর অবস্থানের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈরি করে ফেলুন। ওকে?'

'অল রাইট।' অটোবায়োগ্রাফিটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফাইল আর কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলের অন্য মাথায় বসে পড়ল ক্যাপ্টেন পিয়েনার। 'দেখা যাক্, ওর ভেতর থেকে সাপ-ব্যাঙ কিছু বেরোয় কিনা। আমার মনে হয়, লোকটা যদি সত্যিই মচকে গিয়ে থাকে, তো বিদেশেই কোথাও ঘটেছে ব্যাপারটা। দেশে নয়।'

ক্যাপ্টেনের 'যদি' শুনে মনে হলো, কোন আফ্রিকান বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, সে তা মনে করে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অ্যাঙ্গাসের জীবনীর দিকে মন দিল মাসুদ রানা।

"উত্তর ট্রান্সভালের ডুয়েলস্‌ক্লুফ শহরে ১৯২৫ সালের ৮ আগস্ট আমার জন্ম। আমার বাবা, ভ্যান অ্যাঙ্গাস ছিলেন কৃষিজীবী। খাঁটি আফ্রিকানার। কিন্তু আমার মা ছিলেন অ্যাঙলো। তখনকার দিনে এ ধরনের অসম বিয়ে বিরল ঘটনা ছিল। তবে এর ফলে আমি বেশ উপকৃত হই, ছোটবেলা থেকেই পিতৃভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার ওপরও সমান দক্ষতা অর্জন করি আমি। আমি ছিলাম বাবা-মার একমাত্র সন্তান।

আমার বাবা আর মার বয়সের ব্যবধান ছিল বিস্তর। আমার জন্মের সময় বাবার বয়স ছিল চৌষট্টি, আর মার মাত্র ছাব্বিশ, দ্বিগুণ থেকেও অনেক বেশি। আমার দশ বছর বয়সের সময় টাইফয়েডে মৃত্যু হয় মার। সে সময় ওই অঞ্চলে কিছুদিন পর পরই এই বিশেষ রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা দিত।"

পড়ে যেতে থাকল মাসুদ রানা…"১৯৩৯ সালে বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বাবা ছিলেন ইউনাইটেড পার্টির কড়া সমর্থক। সেই সূত্রে মিত্রজোট তথা ব্রিটেনের সমর্থক। যুদ্ধের খবর শোনার জন্যে সারাক্ষণই একটা ট্র্যানজিস্টর সঙ্গে থাকত তাঁর। মা মারা গেছেন। বাবা ছাড়া আর

কেউ ছিল না আমার, তাই আমি সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। বিবিসি, ভোয়া, রেডিও অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদির খবর শুনতাম আর বাবার মত উদ্দীপ্ত হতাম।

"সে সময়ই যুদ্ধে যোগ দেয়ার ইচ্ছে জাগল মনে। কিন্তু বয়স অল্প বলে বাবা সায় দিলেন না। পরে ১৯৪৩ সালের ১০ আগস্ট, আমার আঠারোতম জন্মদিনের দু'দিন পর, বাবার প্রচণ্ড আপত্তি অগ্রাহ্য করে পিটার্সবার্গের উদ্দেশে ডুয়েলস্‌ক্লুফ ত্যাগ করি আমি। বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হয় আমার পিটার্সবার্গ রেল স্টেশনে। আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে না পেরে আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন বাবা ওই পর্যন্ত। ওখান থেকে অন্য ট্রেনে চেপে প্রিটোরিয়া রওনা হই আমি।

"শেষ দেখার সেই বিশেষ সময়টি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মনে থাকবে আমার। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, বাবা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাত নাড়ছেন। চোখে টলটল করছে পানি। প্রিটোরিয়া পৌঁছে পরদিন সকালে উপস্থিত হই প্রতিরক্ষা সদর দফতরে এবং আর্মিতে নাম লেখাই। একদিন পর আরও অনেক নতুন রিক্রুটের সঙ্গে রবার্টস হেইটস্‌ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। ওখানেই যুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয় আমার।"

মুখ তুলল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরাল। 'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, মেজর মাসুদ রানা,' বলে উঠল ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস। 'চলুন, আমাদের ক্যান্টিনে যাই।'

পড়ায় ডুবে যেতে যেতে বলল রানা, 'এখানেই কিছু আনিয়ে খেয়ে নেয়া যায় না? স্যাণ্ডউইচ আর কফি?'

'শিওর। ফোন করে আনিয়ে নিচ্ছি আমি।'

কানে গেল না রানার। ছেড়ে ছেড়ে দ্রুত পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক

জায়গায় এনকেভিডি, পরবর্তীতে কেজিবি, লেখা দেখে সতর্ক হয়ে উঠল ও। বাক্যটা ছিল : "আমাকে এনকেভিডির হাতে তুলে দেয়া হয়"। কেন? কয়েক প্যারা পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা। একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে পড়তে শুরু করল আবার।

"আমরা তখন সাইলেসিয়ান প্লেইনে। হঠাৎ করেই সামনের দিক থেকে আমাদের ট্রাকের ওপর শুরু হলো জার্মানদের গুলি বৃষ্টি। চোখের সামনে সঙ্গীদের টপাটপ্ মরতে দেখে ভয়ে হাত পা অসাড় হয়ে এল আমার। ভাগ্য ভাল, ট্রাকের একেবারে পিছনদিকে ছিলাম আমি। তাই তখনও গুলিবিদ্ধ হইনি। থেমে পড়ল ট্রাক, কারণ ড্রাইভার মারা গেছে।

"আমার পাশেই ছিল আরেক অপরিচিত আফ্রিকানার। বেশ সাহসী ছিল সে, অন্তত আমার থেকে। হাত ধরে টেইলবোর্ডের দিকে টানল সে আমাকে। বলল, 'চলো, পালাই'। আরও অনেকে থাকতে আমাকেই কেন ধরল সে জানি না। সে যাই হোক, ভাবলাম, এখানে বসে থাকলে মরতেই হবে। কারণ শত্রুর অ্যামবুশের একেবারে মাঝখানে পড়ে গেছি আমরা। কেবল পিছন বাদে অন্য তিন দিক থেকেই সমানে গুলি চলছে তখন। কাজেই বসে না থেকে একবার চেষ্টা করেই দেখি বাঁচা যায় কি না।

"পরের ঘটনা, কেবল মনে আছে, সেই ছেলেটা আর আমি প্রাণভয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢোকার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। পালাবার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করিনি বলেই বেঁচে গেলাম সে যাত্রা। কিন্তু পরে টের পেলাম, আসলে ফুটন্ত কড়াই থেকে পড়েছি আমরা জ্বলন্ত চুলোয়। রাতে সাইলেসিয়ান প্লেইনের তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে। সে যে কী অমানুষিক কষ্ট, বলে বোঝানো অসম্ভব।

"প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে গেল আমার প্রাণ রক্ষাকারী সঙ্গীর। ওই পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম আমি তার সেবা শুশ্রূষা করার,

কিন্তু কাজ হলো না। মাত্র দু'দিন ভুগেই মারা গেল ছেলেটা। ...এর সম্ভবত তিন দিন পর রুশ সৈন্যরা জঙ্গল থেকে পাকড়াও করে আমাকে। জার্মান স্পাই সন্দেহ করে তুলে দেয় এনকেভিডির হাতে।

"আমি জার্মান স্পাই, কথাটা আমার মুখ থেকে বের করার জন্যে দীর্ঘ পাঁচ মাস প্রচণ্ড নির্যাতন চালায় ওরা আমার ওপর। কিন্তু আমি স্বীকার করিনি। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ততদিনে, অথচ আমি জানি না। যা হোক, ১৯৪৫ সালের আগস্টে জার্মানির পটস্ড্যামে ব্রিটিশ আর্মির কাছে আমাকে হস্তান্তর করে এনকেভিডি। আমি তখন মৃতপ্রায়। কিছুদিন বেলিফেল্ড হাসপাতালে রাখা হয় আমাকে, তারপর ওখান থেকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওখানে আরও তিন মাস গ্লাসগোর কিলার্ন ইএমএস হসপিটালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয় আমাকে।

"ডিসেম্বরে সাউদাম্পটন থেকে ইলি ডি ফ্রান্স নামের জাহাজে চড়ে কেপ টাউন রওনা হই আমি। এবং সেখানে পৌঁছে জানতে পাই আমার একমাত্র আত্মীয়, পৃথিবীর একমাত্র বন্ধন, আমার বাবা মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি। ভর্তি হই কেপ টাউনের ওয়েনবার্গ মিলিটারি হসপিটালে। ওখানে দু'মাস চিকিৎসাধীন রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয় আমাকে। আমি, ডি অ্যাঙ্গাস, এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বিধায় সাউথ আফ্রিকান ফরেন সার্ভিসে চাকরির আবেদন করছি।"

মুখ তুলল মাসুদ রানা। 'পড়া শেষ?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ। আপনার কাজ?'

'শেষ'। কোথাও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। একদম ঝরঝরে ক্যারিয়ার। বলছি, শুনুন। মোট আটটি দেশে কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করেছেন ডি অ্যাঙ্গাস, প্রতিটি প্রো-ওয়েস্টার্ন দেশ। বিয়ে করেননি, ব্যাচেলর।' রানার কপালের কুঞ্চন কমছে না দেখে প্রশ্ন করল পিয়েনার,

'আপনি কি এখনও ভাবছেন ভদ্রলোকের মধ্যে সত্যিই কোন গড়বড় আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'এই লাইফ স্টোরি, এর মধ্যে কোথাও যেন গণ্ডগোল আছে। ধরতে পারছি না, ক্যাপ্টেন।'

'অল রাইট,' একটু যেন বিরক্তি প্রকাশ পেল পিয়েনারের কণ্ঠে। 'বলুন, এরপর কি। আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্যেই আছি। কোত্থেকে শুরু করতে চান?'

'একদম শুরু থেকে,' অ্যাঙ্গাসের জীবন বৃত্তান্তের ওপর 'ঠক্' 'ঠক্' করে টোকা দিল রানা। 'এই গ্রাম, ডুয়েলস্‌ক্লুফ থেকে। কতদূর জায়গাটা?'

'চার ঘণ্টার ড্রাইভ। যেতে চান?'

'ইয়েস, প্লীজ।'

'আজই?'

'না, কাল খুব সকালে। ধরুন ছটায় স্টার্ট করতে চাই।'

'কোন অসুবিধে নেই। ঠিক সময়ে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাব আমি আপনার হোটেলে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। আজই যেতাম, কিন্তু ফাইলটা আরও খানিক পরীক্ষা করা প্রয়োজন।'

মস্কো। মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে ডিটাচ করার পরদিন সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেসের আরও দু'জনকে স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে বদলি করা হলো তাড়াহুড়ো করে।

মস্কোর একশো মাইল পশ্চিমে, মস্কো-মিনস্ক হাইওয়ের পাশে পাইনের বিশাল এক বন। ওর মাঝে, লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়ালে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম বৃহৎ লিসেনিঙ কমপ্লেক্স। বহির্বিশ্ব থেকে পাঠানো ওয়ারশ প্যাক্টের রেডিও সিগন্যাল ধারণ করা হয় এখানে আকাশ-

ছোঁয়া অজস্র রেডিও ডিশ এরিয়েলের সাহায্যে।

কেবল তাই নয়, সোভিয়েত সীমান্তের ওপারে, আরও বহু বহুদূরের সিগন্যালও ধারণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এই পোস্ট। এর একটা বড় অংশ পুরোপুরি আলাদা অন্য অংশ থেকে, শুধুমাত্র কেজিবির ব্যবহারের জন্যে। এখান থেকেই বদলি করা হলো একজনকে—ওয়ারেন্ট অফিসার রেডিও অপারেটর সে।

'লোকটা ছিল আমার পোস্টের সেরা অপারেটর,' কমপ্লেক্সের কম্যাণ্ডিং কর্নেল তাঁর ডেপুটির উদ্দেশে আক্ষেপ করে বললেন। তাকে ডিটাচ করার সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশ পৌঁছে দিয়ে খানিক আগে বিদেয় নিয়েছে সেই দুই ব্যক্তি, আগেরদিন যারা মেজর জেনারেল ভ্লাদিমির চেরনোভস্কির অফিসে গিয়েছিল।

'খুব ভাল ছিল?'

'ভাল মানে?' ডেপুটির প্রশ্নে রেগে উঠলেন কর্নেল। 'আমি তো বলি আমাদের সেরা রেডিও অফিসার ছিল ও। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট পেলে ক্যালিফোর্নিয়ার কোথায় কোন্ তেলাপোকা পিঠ আঁচড়াচ্ছে, পরিষ্কার ট্রেস করতে পারে ও।'

অন্যজন আর্মির এক কর্নেল। আর্টিলারির। আসলে কর্নেল যতটা না সৈনিক, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞানী। কাজ করে রিসার্চ ডিভিশনের অর্ডন্যান্স ডিরেক্টরেটে।

মেজর কিরলভকে অনুসরণ করে দাচার চোখ ঝলসানো গেস্ট উইঙে এসে পৌঁছল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। মনে হচ্ছে, অসহ্য উচ্ছ্বাস আর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দে বুকটা যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে তার। ইংরেজিতে তুখোড় ভ্যালেরির জানা আছে সেই ফ্রেজ, 'টু ডাই ফর গড, কিং অ্যাণ্ড কান্ট্রি'।

তার গড নেই, তবে কিং আছে, আছে কান্ট্রি—মাদার রাশিয়া। তার জন্যে যে কোন মুহূর্তে মরণকে বরণ করতে সে প্রস্তুত। একটা বন্ধ দরজার সামনে থামল মেজর কিরলভ। নক করল। তারপর আস্তে করে মেলে ধরল। সরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করল তাতায়েভকে ভেতরে ঢুকতে।

পা বাড়াল সে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আরেকজন আছেন ভেতরে। বিশালবপু ড. পাভলভ। 'মেজর ভ্যালেরি?' এগিয়ে এলেন তিনি। বাড়িয়ে ধরলেন ডান হাত।

বিস্মিত হলো মেজর। এ মুখ তার খুব চেনা, যদিও পরিচয় নেই। সে জানে, এ লোক কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দাবার গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'ইয়েস, কমরেড পাভলভ।' হ্যাণ্ডশেক করল সে তাঁর সঙ্গে।

'বসুন, মেজর।'

'ধন্যবাদ।'

কয়েক মুহূর্ত মেজরের দিকে চেয়ে থাকলেন পাভলভ অপলক। এর জীবনী প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর। উচ্চতা ছয় ফুট দুই, বয়স আটাশ। দশ বছরের একাগ্র সাধনার ফলে একজন লিমির মতই ঝরঝরে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে সে, তাতে রুশ অ্যাকসেন্টের সামান্যতম আভাসও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু চোস্ত ইংরেজিই নয়, ওয়েলস এবং আইরিশেও সমান ওস্তাদ ভ্যালেরি।

এর আগে দু' দফা ব্রিটেনে থেকে এসেছে ভ্যালেরি ছয় মাস করে, ডীপ কভার এজেন্ট হিসেবে। এ ধরনের ট্রিপকে 'ফ্যামিলিয়ারাইজেশন' বলে ডিরেকটরেট 'এস'। পরে কাজে লাগে এর অভিজ্ঞতা। ওদেশে গিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এখন তেমন অসুবিধে হবে না তাতায়েভের। বহিরাগত মনে হবে না নিজেকে সারাক্ষণ।

অবশ্য শুধু ঘুরতেই পাঠায় না এদের 'এস'। সঙ্গে কিছু কাজও করতে

হয়। যে দেশেই পাঠানো হোক, প্রথমেই নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় সেখানে এজেন্টকে। জানতে হয় ড্রাইভিং লাইসেন্স করার পদ্ধতি। ট্রেন, ট্রাম, বাস, আণ্ডার গ্রাউণ্ড রুট ভাল করে চিনে নিতে হয়। শিখতে হয় নতুন নতুন জনপ্রিয় বচন, গালাগাল।

'ওয়েল, জেন্টলম্যান,' ইংরেজিতেই শুরু করলেন জোসেফ পাভলভ। একসময় মস্কো ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির ছাত্র ছিলেন তিনিও। দু'ঘণ্টা ধরে প্ল্যান অরোরার নাড়ি নক্ষত্র ব্যাখ্যা করলেন ডক্টর। 'এগুলো সব গেঁথে নিন মনের ভেতর। ওদেশে যাওয়ার সময় সঙ্গে থাকবে আপনার শুধু একটা ওয়ান-টাইম প্যাড, আর কিছুই নয়।'

বলার প্রয়োজন ছিল না, এতক্ষণ যা যা শুনেছে তাতায়েভ, তৎক্ষণাৎ তা হজম করে ফেলেছে। একটা কমা ফুলস্টপও ভুল হবে না তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়। 'ইয়েস, কমরেড পাভলভ। সময় মত অন্য সব সাপ্লাই পৌঁছলে আর কিছুই প্রয়োজন হবে না আমার।'

'গুড। এবার আপনাকে মস্কোয় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে আরও একবার ইনটেনসিভ সেশনে বসতে হবে কয়েকজন এক্সপার্টের সঙ্গে। দেশত্যাগ করার আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন আপনি।'

মাথা দোলাল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ।

বাযার টিপলেন জোসেফ পাভলভ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোরগোড়ায় উদয় হলো কিরলভ। 'ওয়েল,কমরেড,' বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'আনটিল উই মিট আগেইন, গুড লাক। অ্যাণ্ড গুড বাই।'

আট

চওড়া মোটরওয়ে ধরে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের দিকে ছুটছে রানা আর পিয়েনার। এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা এরমধ্যে। নাইলস্ট্রম আর পটজিয়েটারস্‌রাস পিছনে ফেলে পিটার্সবার্গের দিকে চলেছে এখন। দুপাশে ধু-ধু আফ্রিকার বিশাল বিস্তৃতি। তারও ওপাশে, উত্তরে, যেখানে মাটি ছুঁয়েছে আকাশ, জিম্বাবুয়ের দক্ষিণ সীমান্ত।

হঠাৎ করেই রেবেকা সাউলের মুখটা ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায়। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও। ভালবেসে ফেলেছিল মেয়েটি দুর্দান্ত বেপরোয়া বাঙালি যুবক মাসুদ রানাকে। আজও ভুলতে পারেনি ও রেবেকার স্মৃতি। ভুলতে পারেনি সবিতা আর অনিতার স্মৃতিও। পারবেও না কোনদিন। থেকে থেকেই স্মৃতির আরশিতে উদয় হয় ওরা, বুকের কোথায় কোন গভীর গহনে অব্যক্ত এক বেদনা অনুভব করে মাসুদ রানা।

নড়েচড়ে বসল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডি অ্যাঙ্গাসের মধ্যে ডুবে গেল। ঠিক নয়টা পঞ্চাশে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফ পৌঁছল ওরা। গতি কমিয়ে খুদে শহরটির প্রধান রাস্তা বোথা অ্যাভিনিউতে গাড়ি ঢোকাল পিয়েনার। 'কোথায় যেতে চান প্রথমে?'

'লইয়ারের অফিসে,' বলল রানা। গতকাল কথায় কথায় জেনারেল গেরহার্ডের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে ও, এ দেশের ছোট ছোট মফস্বল

শহরে সরকার নিয়োজিত একজন করে লইয়ার থাকে। সব ধরনের দলিল তার অফিসেই সম্পাদিত হয়।

একটা কাফের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস। 'এদের কাছ থেকে লইয়ারের ঠিকানা জানতে হবে। চলুন, এই ফাঁকে এক কাপ কফিও পান করা যাক।'

কফি সার্ভ করার আগেই ম্যানেজারকে প্রশ্ন করে ঠিকানা বের করে ফেলল ক্যাপ্টেন। 'লোকটা অ্যাংলো,' ফিরে এসে বলল সে। 'নাম জনসন। কাছেই অফিস, রাস্তার ওপারে।'

অ্যানড্রিয়াসের ওয়ালেটে চোখ বুলিয়েই তড়াক করে আসন ছাড়ল জনসনের সেক্রেটারি। ভেতরের অফিসে গিয়ে ঢুকল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বলল, 'আসুন, প্লীজ।'

জনসন মাঝবয়সী, সম্ভবত পঞ্চাশের কাছাকাছি, অনুমান করল মাসুদ রানা। আমুদে স্বভাবের, বেশি কথা বলার মানুষ। মাসুদ রানাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অ্যানড্রিয়াস। 'লণ্ডন থেকে এসেছেন। কিছু তথ্য জানতে চান আপনার কাছে।'

ওদের বসতে ইশারা করল জনসন। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি।'

'আপনার সঠিক বয়স কত, বলবেন দয়া করে?' ভূমিকা বাদ দিয়ে সরাসরি জানতে চাইল রানা।

বিস্ময় চেপে পাল্টা প্রশ্ন করল লইয়ার, 'লণ্ডন থেকে এতদূর এসেছেন আপনি আমার বয়স জানতে?' পরক্ষণেই হাসল সে। 'সরি। আমার তেপ্পান্ন চলছে।'

'তার মানে ১৯৪৬ সালে আপনি বারো বছরের ছিলেন?'

একটু চিন্তা করে মাথা দোলাল লোকটা। 'হ্যাঁ।'

'ওই বছর এখানকার লইয়ার কে ছিলেন, বলতে পারেন?'

'নিশ্চই। আমার বাবা, হ্যারি জনসন।'

'উনি বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে। আশি ছাড়িয়ে গেছে বাবার বয়স। হলে হবে কি, এখনও প্রায় আমার মতই কর্মঠ। পনেরো বছর আগে রিটায়ার করেছেন তিনি।'

'তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব?'

'এক মিনিট,' রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল পুত্র জনসন। এক মিনিট লাগল না, আধ মিনিট পর রিসিভার রেখে রানার দিকে ফিরল। 'সম্ভব। উনি আসছেন। একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

'শিওর। এই ফাঁকে আপনাকেও একটু কষ্ট করতে হবে। পুরানো ফাইল ঘেঁটে চেক করে দেখুন, ওই বছর এখানকারই এক কৃষিজীবী, নাম ভ্যান অ্যাঙ্গাস, কোন উইল সম্পাদন করেছিলেন কিনা।'

'নিশ্চই, দেখছি,' আসন ছাড়ল জনসন। 'একটু সময় লাগতে পারে, অনেক দিন আগের কথা তো! এক্সকিউজ মি।' বেরিয়ে গেল সে অফিস ছেড়ে।

মিনিট দশেক পর বাপ-বেটা এক সঙ্গে অফিসে ঢুকল। ছেলের হাতে ধুলোমাখা একটা কার্ডবোর্ড বক্স। মাথার চুল ধপধপে সাদা হ্যারি জনসনের। বয়সের ভারে সামান্য নুয়ে পড়েছে দেহ সামনের দিকে। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, এখনও যথেষ্ট শক্তি ধরেন। রানাকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ছেলে। ঘুরে ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসলেন বৃদ্ধ ছেলের আসনে। আরেকটা চেয়ার টেনে বাপের পাশে বসল সে।

'হ্যাঁ,' বললেন প্রাক্তন লইয়ার। 'ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। সম্পত্তির উইল করিয়েছিল সে মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে। আমিই করেছি সে উইল।' বক্স খুলে ভেতর থেকে ধূসর কভারের

একটা ফাইল বের করলেন বৃদ্ধ। সোনালি ফ্রেমের একটা চশমা নাকে লটকে চোখ বোলাতে আরম্ভ করলেন ওটার ভেতরে। 'হ্যাঁ, এই তো। সব আছে এখানে। বিপত্নীক ছিল ভ্যান অ্যাঙ্গাস। মৃত্যুর সময় কেউ ছিল না কাছে। একটিই সন্তান তার, ডি অ্যাঙ্গাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে সে। যুদ্ধ শেষে ডি অ্যাঙ্গাস যখন দেশে ফিরে আসে, ঠিক তখনই মৃত্যু হয় ভ্যানের। ছেলেকে রিসিভ করতে কেপ টাউন যাওয়ার পথে,' থেমে মাথা দোলালেন বুড়ো জনসন। 'খুবই দুঃখজনক।'

'সম্পত্তি কাকে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'ছেলেকেই। যাবতীয় কিছু। অনেক বড় কৃষি খামার ছিল ভ্যানের। খামার, বাড়ি, কৃষি যন্ত্রপাতি সব দিয়ে গেছে ছেলেকে।'

'আর কাউকে কিছুই দেননি তিনি?'

চোখ নামিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টালেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, একটা আইভরির দাবা সেট দিয়ে গিয়েছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। অবসর সময়ে তার সঙ্গেই দাবা খেলত ভ্যান ওই সেট দিয়ে।'

'এই খামার আর অন্যান্য সম্পত্তি এখন কি অবস্থায় আছে, মিস্টার জনসন?'

'অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।'

'আপনার উপস্থিতিতে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। তবে বিক্রি করেছে আসলে অকশনিয়ার। আমি উপস্থিত ছিলাম উইলের এক্সিকিউটর হিসেবে।'

'ওসবের মধ্যে ভ্যান অ্যাঙ্গাসের এমন কোন ব্যক্তিগত কিছু কি ছিল, যা বিক্রি হয়নি? আই মীন আপনার জানামতে?'

ভুরু কুঁচকে ভাবলেন বৃদ্ধ। 'না, তেমন কিছু ছিল না। সবই বিক্রি…হ্যাঁ, ছিল, মনে পড়েছে। একটা পারিবারিক ফটো অ্যালবাম ছিল

ভ্যানের। কমার্শিয়াল মূল্য নেই বলে ওটা বিক্রি হয়নি।'

উৎসাহিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। মনে মনে এ ধরনেরই কিছু একটা চাইছিল ও। 'ওটা আছে আপনার কাছে?'

'না, দুঃখিত। ভ্যানের সেই বন্ধুই ওটা চেয়ে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে।'

'তিনি কে?'

'নাম ভ্যান বার্গ,' বলল ছেলে, 'আমার স্কুল শিক্ষক ছিলেন ভদ্রলোক।'

'বেঁচে আছেন?'

'না। প্রায় দশ বছর আগে মারা গেছেন,' বললেন বুড়ো জনসন।

'তাঁর এক মেয়ে আছে, সিসি। আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল,' আবার নাক ঢোকাল ছোট জনসন।

'কোথায় আছে সে, জানেন?'

'হ্যাঁ, এই শহরেই আছে। যানিন রোডে বাসা।'

বৃদ্ধের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'ভ্যান অ্যাঙ্গাসের সম্পত্তি কেন বিক্রি করা হয়েছিল? কার কথায়?'

'তার ছেলের কথায়, অবশ্যই। সে সময় ছেলেটা কেপ টাউনের ওয়েনবার্গ মিলিটারি হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিল। টেলিগ্রামে সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল সে আমাকে। টেলিগ্রাম পেয়ে তার সত্যতা যাচাই করার জন্যে আমি ডি অ্যাঙ্গাসের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠাই। নিজে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তখনকার দিনে ট্রেন ছাড়া যোগাযোগের আর কোন পথ ছিল না। অতদূর আসা-যাওয়ায় প্রায় আট-দশদিন লেগে যেত। তাই, মানে, ব্যবসার কথা চিন্তা করে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারিনি। অ্যাঙ্গাসের কর্তৃপক্ষ তার পরিচয় সম্পর্কে আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে চিঠি পাঠায়। তারপর ওগুলো বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং

টাকাগুলো অ্যাঙ্গাসের অনুরোধে ওই হাসপাতালের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই।'

'পিতার শেষকৃত্যে আসেনি সে?'

'না। এলেও পেত না। জানুয়ারি আমাদের এখানে পুরো গরমের সময়। মর্গের সুবিধে সেকালে তেমন ছিল না; তাই তাড়াতাড়ি সমাধিস্থ করা হয় ভ্যান অ্যাঙ্গাসকে। আর সুযোগ থাকলেই যে আসত সে, আমি মনে করি না। শেষ সম্বল বাপই যখন নেই, এতদূর ছুটে এসে কি লাভ হতো তার?'

মন্তব্যটা যেন মনে ধরেছে ক্যাপ্টেন পিয়েনারের। এই প্রথম মুখ খুলল সে এতক্ষণে। 'ঠিক।'

'ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কবরটা কোথায়?'

'পাহাড়ের ওপর। কবরস্থানে।'

জনসন জুনিয়রের কাছ থেকে স্কুল শিক্ষকের মেয়ে সিসির ঠিকানা নিয়ে বাপ-বেটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সিসির স্বামীর করাত কলের ব্যবসা আছে। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না অফিসে। এক কর্মচারী কারখানার পিছনে মালিকের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল রানা আর পিয়েনারকে। স্থানীয় ভাষায় সিসিকে ওদের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করল সে।

সব শুনে নেতিবাচক মাথা দোলাল মহিলা। 'দাবার কথা মনে আছে। কিন্তু অ্যালবাম···নাহ্! মনে পড়ছে না।'

'আপনার বাবার মৃত্যুর পর তার জিনিসপত্র আপনিই তো পেয়েছেন?'

'না। ওসব বাবার বাড়িতেই আছে। তার অনেক আগেই বিয়ে হয় আমার। তারপর আর ওসব দিকে নজর দেয়ার খুব একটা সুযোগ পাইনি। বাবার বিধবা এক বোন আছেন ও বাড়িতে। তিনিই বর্তমানে ওগুলোর মালিক।'

ঠিকানা নিয়ে আবার পথে নামল ওরা দুজন। ভাইয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই

চোখে পানি এসে গেল বৃদ্ধার। উঠে গিয়ে আলমারির ভেতর থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স বের করে নিয়ে এল। 'বেচারা! সারাদিন এই দাবা নিয়েই পড়ে থাকত। এটাই তো খুঁজছেন আপনারা?'

'না, এটা নয়। আরেকটা জিনিস। একটা অ্যালবাম।'

'অ্যালবাম!' কিছু ভাবল বৃদ্ধা। 'দাঁড়ান, দেখি। আছে মনে হয়। একবার দেখেছিলাম।' ভেতরে চলে গেল সে।

ফিরে এল পুরো দশ মিনিট পর। হাতে একটা চামড়া বাঁধানো অ্যালবাম। 'এই যে, পেয়েছি।'

নিল ওটা মাসুদ রানা। পুরু কভার তুলে ভেতরে তাকাল। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ভ্যান অ্যাঙ্গাসের পারিবারিক অ্যালবাম। সেই ১৯২০ সাল থেকে তোলা নানা উপলক্ষের ছবি। ডি অ্যাঙ্গাসের অ্যাংলো মায়ের বিয়ের পোশাক পরা লাজুক হাস্যিমাখা একটা ছবি দেখল রানা কিছুক্ষণ। '২০ সালে, বিয়ের সময় তোলা। অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন মহিলা। '২৫ সালে জন্ম হয় তার একমাত্র সন্তানের। বিয়ের পাঁচ বছর পর। '৩০ সালে তোলা তাঁর আরেকটা ছবির ওপর নজর পড়ল। শিশু অ্যাঙ্গাসকে কোলে নিয়ে হাসিমুখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাগজ লাল হয়ে এলেও ছবিগুলো এখনও বেশ স্পষ্ট। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আবার থামল রানা। জীবনে প্রথম টাট্টু ঘোড়ার পিঠে ওঠার কসরৎ করছে কিশোর অ্যাঙ্গাস। দূরে দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন ভ্যান অ্যাঙ্গাস। চোখেমুখে তাঁর ফুটে আছে পিতৃত্বের অহঙ্কার। পায়ের সামনে এক দল খরগোশ হুটোপুটি করছে।

সবার শেষের ছবিটার ওপর আবার দৃষ্টি থমকাল রানার। সতেরো বছরের তরুণ, স্মার্ট ডি অ্যাঙ্গাস। পরনে ক্রিকেট ফ্ল্যানেল। উইকেটের দিকে ছুটে আসছে বল করতে। ছবির নিচে ক্যাপশন : ডি অ্যাঙ্গাস,

ক্যাপ্টেন অভ ক্রিকেট, মেরেনস্কি হাই স্কুল, ১৯৪৩। ওটাই শেষ ছবি। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল রানা ছবিটার দিকে। ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে চেহারা।

'আমরা অ্যালবামটা নিয়ে যেতে পারি?' রানার মনের ভাব টের পেয়ে আগেভাগে নিজে থেকেই বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন অ্যান্ড্রিয়াস।

'হ্যাঁ।'

'আপনার ভাই কখনও মিস্টার ভ্যান অ্যাঙ্গাসের গল্প করেছেন আপনার সঙ্গে?'

'করবে না কেন! অনেকবার। কতদিনের পুরানো বন্ধুত্ব ছিল ওদের।'

'কিভাবে অ্যাঙ্গাস মারা যান, শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। কেন, আপনাদের বলেনি বুড়ো জনসন? আসলে বুড়োর স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যাঙ্গাস মারা গেছে একটা হিট্-অ্যাণ্ড রান অ্যাকসিডেন্টে।' কথাটা কানে যাওয়ামাত্র শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'ছেলেকে রিসিভ করতে কেপ টাউন যাচ্ছিল সে। পথের মাঝে গাড়ির ফুটো হয়ে যাওয়া টায়ার বদল করার সময় একটা দ্রুতগামী ট্রাক চাপা দেয় বেচারা অ্যাঙ্গাসকে। প্রথমে ধারণা করা হয়, ট্রাক চালক মাতাল ছিল। কিন্তু…।' আচমকা থেমে গেল বৃদ্ধা, চেপে ধরল নিজের মুখ। আড়চোখে মাসুদ রানার কঠিন মুখের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন এক পলক।

'দুঃখিত। এসব নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না আমার। সে যাই হোক, সেই চালকটির খোঁজ আর কোনদিন পাওয়া যায়নি।'

গাড়িতে এসে উঠল রানা আর পিয়েনার। রানা গম্ভীর। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টোকা মারছে অনবরত অ্যালবামের শক্ত চামড়ার ওপর।

'এবার?' বলল ক্যাপ্টেন।

'পাহাড়ে। কবরস্থানে।'

ভুরু কুঁচকে গাড়ি স্টার্ট দিল পিয়েনার। ডুয়েলস্ক্লুফের মাইল দুয়েক

উত্তরে, ছোটখাট এক পাহাড়ের ওপর জায়গাটা। কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত, সমাহিত। ঠিক কবরের মতই। অনেক নিচে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফ। ছবির মত। বিশাল এক মাওয়াটাবা গাছের নিচে ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কবর। ওর মাথার কাছে পাথরের স্মৃতি ফলকে বসে অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠে গান গাইছে ছোট একটা নাম না জানা পাখি। যেমন সুন্দর সুর, তেমনি পাখির চেহারা।

রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে গান থামিয়ে গলা টান করে উড়ি উড়ি ভাব নিয়ে বসে থাকল পাখিটা। কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা। চোখ বোলাল ফলকে। গ্র্যানিট পাথরে খোদাই করে লেখা ঃ ভ্যান অ্যাঙ্গাস, জন্ম ১৮৭৯, মৃত্যু ১৯৪৬, অলওয়েজ উইথ গড। অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে চেয়ে থাকল ও।

পায়ের কাছে একটা জংলা গাছের লম্বা ডালওয়ালা ফুল ছেঁড়ার জন্যে ঝুঁকল ও। বিপদ ভেবে সুড়ুৎ করে উড়াল দিল পাখি। ফুলটা নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে কবরের মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। আলতো করে রেখে দিল ওটা ভ্যান অ্যাঙ্গাসের বুক সোজা। তাজ্জব হয়ে ওর কার্যকলাপ দেখছে পিয়েনার দূর থেকে।

একটু পর রওনা হলো ওরা ফিরতি পথে। পিছন ফিরে পাহাড়টার দিকে তাকাল রানা শেষবারের মত। গাঢ় মেঘ জমেছে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের আকাশে। এখনই নামবে হয়তো বৃষ্টি। সে বৃষ্টিতে সব পাপ-পঙ্কিলতা হয়তো ধুয়েমুছে যাবে, যাবে না কেবল একটি সত্য, গোপন করে যাওয়া চরম এক সত্য। যা আবিষ্কার করেছে হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসা অনুসন্ধিৎসু এক বাঙালি যুবক, মাত্র কিছুক্ষণ আগে।

কবরে ফুল দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করবে বলে মুখ ঘোরাল অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। কিন্তু চোখ বুজে রানাকে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে করল না।

*

মস্কো। ইয়াসিনেভোর সাততলা ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের চারতলায়, নিজের বিশাল অফিস রূমে চিন্তিত মুখে বসে আছেন এর প্রধান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ। ছয় ফুটের মত লম্বা ভদ্রলোক। বয়স বাষট্টি। গোল থালার মত বড়সড় মুখটা টকটকে লাল। বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় নীল চোখ। সোনালি চুল, এলোমেলো। জানালা দিয়ে সড়কের দু' পাশে বরফের টুপি পরে দণ্ডায়মান সারি সারি পাইনের দিকে চেয়ে আছেন তিনি।

আজ রোববার। সরকারি ছুটির দিন। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী সবাই পেরেদেলকিনোয় তাঁর দাচায় অবসর কাটাতে গেছে। যেতে পারেননি কেবল জেনারেল বরিসভ। এ ধরনের উঁচু পদে থাকলে যা হয়; বিনা নোটিসে ঘাড়ে এসে চাপে ঝামেলা, আজও তাই হয়েছে। কোপেনহেগেন থেকে জরুরি এক বার্তা আসার কথা, তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বসে আছেন তিনি প্রায় জনমানবহীন এফসিডি বিল্ডিঙে।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠলেন বরিসভ। রিসিভার তুললেন।

'ইয়েস?'

'কমরেড মেজর জেনারেল ভ্লাদিমির চেরনোভস্কি লাইনে অপেক্ষা করছেন, কমরেড জেনারেল।'

'লাইন দাও,' কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে উঠল তাঁর। 'ভ্লাদিমির, কি ব্যাপার? এমন অসময়ে?'

'হ্যাঁ, দুঃখিত। বাসায় না পেয়ে দাচায় চেষ্টা করেছিলাম। লুদমিলা বলল কি কাজে অফিসেই রয়েছ তুমি।'

'হ্যাঁ। জরুরি একটা কাজ পড়ে গেছে। সে যাক, বলো, কি খবর?'

'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। খুব জরুরি, বরিসভ।'

'বেশ তো, চলে এসো। নাকি চাইছ, আমি আসি?'

'এলে খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, কাল আসা যাবে।'

'কাল নয়, বরিসভ। আজই।'

'আজই!' কপালও কুঁচকে উঠল এবার জেনারেলের। 'ভ্লাদিমির, ব্যাপার কি? কোন অসুবিধে?'

'সামনা-সামনি বলব।'

ঠিক, নিশ্চয়ই কোথাও কোন ঝামেলা হয়েছে। চেরনোভস্কি তাঁর স্কুল জীবনের বন্ধু। খুব সহজে উতলা হওয়ার মানুষ তিনি নন। খুব সম্ভব জটিল কিছু হবে। 'অল রাইট, স্টারেট। কোথায় আসতে হবে?'

'আমার বাসায় চলে এসো।'

'কখন?'

'সন্ধেয়। ধরো, ছ'টায়?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন বরিসভ। যাও বা একটু আশা ছিল বিকেলে দাচায় যাওয়ার, দিল ব্যাটা নষ্ট করে। তবে তা নিয়ে মনে আক্ষেপ নেই তাঁর। ভ্লাদিমির যখন এত জরুরিভাবে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই মারাত্মক কিছু না হয়ে যায় না। ক্ষতিটা পুষিয়ে যাওয়ার চান্স আছে। 'ঠিক আছে। ঠিক ছ'টায় পৌঁছে যাব আমি।'

'ধন্যবাদ,' চেপে রাখা দম ছাড়লেন চেরনোভস্কি। 'তোমার জন্যে স্পেশাল ভদকা রেডি থাকবে।'

রিসিভার রেখে দিলেন জেনারেল বরিসভ। বেশিরভাগ রুশ থেকে উল্টো তিনি, মদ খুব একটা পছন্দ করেন না। যখন করেন, হয় আমেরিকান ব্র্যাণ্ডি, নয়ত স্কচ। ওগুলো তাঁর জন্যে লণ্ডন থেকে আসে। বহু বছর ওদেশে কাটিয়ে এসেছেন জেনারেল। তখনই রুচির পরিবর্তন ঘটে তাঁর। ভদকা

তেমন রোচে না। তবুও, খেতেই হয় মাঝেমধ্যে, নানান সরকারি পার্টিতে-ফাংশানে। তা-ও বড়জোর ভদকা। ভদকা? নাক কোঁচকালেন জেনারেল, অসহ্য!

ঠিক ছ'টায় মেজর জেনারেলের স্পাসকায়া প্রসপেক্টের ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন বরিসভ। সাইবেরিয়ান শার্ট, কর্ড ট্রাউজারস আর নরম সোলের জুতো পরা চেরনোভস্কি নিজেই দরজা খুললেন। ভদ্রলোক পার্মানেন্ট ব্যাচেলর। আধ গ্লাস করে কড়া ভদকা নিয়ে মুখোমুখি বসলেন দুই বন্ধু। টুকটাক মামুলি দুয়েকটা বাক্য বিনিময়ের পর বরিসভই প্রথম প্রসঙ্গ তুললেন। 'তারপর, স্টারেট, বলো কি সমস্যা।'

চেরনোভস্কি তার তিন-চার বছরের বড়। তাবে সার্ভিসে এক র‍্যাঙ্ক নিচে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাশভারি মানুষ। চেহারা অনেকটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের মত। সহকর্মীরা প্রায় সবাই তাঁকে পছন্দ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে। তারাই মেজর জেনারেলের নাম দিয়েছে স্টারেট। অর্থাৎ, দ্য ওল্ড ম্যান বা বন্ধু।

বরিসভের চোখে চোখ রাখলেন চেরনোভস্কি। 'আমাদের বন্ধুত্ব কত বছরের ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ?'

বিস্মিত হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। 'এটা আবার কেমন প্রশ্ন?'

'বলোই না।'

'বহু বছরের। সত্যি কথা বলতে, স্মরণাতীত কালের।'

'এর মধ্যে আমি কি তোমার কোন অসুবিধে করেছি? কখনও?'

'তোমার হয়েছে কি, চেরনোভস্কি?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'তুমি আমার বন্ধু, তুমি কেন আমার অসুবিধে করতে যাবে?'

'আবারও ঘুরিয়ে বলছ?'

'আচ্ছা বাবা, না। করোনি। হলো?' হয়েছে কি আজ ওর? ভাবলেন

তিনি।

'তাহলে তুমি কেন এই শেষ বয়সে আমার ডিপার্টমেন্টের পিছনে লেগেছ?'

প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে বসলেন বরিসভ। এ অভিযোগ কেন আমার বিরুদ্ধে?

'কি ঘটেছে তোমার ডিপার্টমেন্টে, খুলে বলছ না কেন, ভ্লাদিমির?'

'কি আর ঘটবে!' তীব্র হতাশা আর আক্ষেপ প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠে। 'বরবাদ করে দেয়া হয়েছে আমার সব। বারোটা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে এস-এর। হয় তুমি রয়েছ এর পিছনে, নয়ত জানো কী চলছে ভেতরে ভেতরে। কি করে কাজ চালাব আমি, যেখানে আমার সেরা মানুষগুলোকে, সেরা ডকুমেন্টস, ফ্যাসিলিটিজ সব বিনা নোটিসে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে? আমার এত বছরের সাধনা···সব এক নিমেষে তছনছ করে দেয়া হয়েছে!'

সম্ভবত এই প্রথম ভ্লাদিমির চেরনোভস্কিকে রাগতে দেখলেন এফসিডি চীফ। অথচ সবাই জানে এঁর মত ঠাণ্ডা মানুষ খুব কমই হয়। মনের ভেতর সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল লেফটেন্যান্ট জেনারেলের। যা-ই ঘটে থাকুক, ঘটেছে। অথচ তিনি জানেন না বিন্দু বিসর্গ। কেন? তিনি ডিরেক্টরেট চীফ, তাঁকে না জানিয়ে 'এস'-এঁর ওপর হাত দেয়ার ক্ষমতা নেই কারও। অন্তত তা তাঁর নলেজে থাকতে হবে। ব্যাপার যত গোপনীয়ই হোক। সামনে ঝুঁকে বসলেন জেনারেল বরিসভ। 'স্টারেট, তুমি বিশ্বাস করো আর না-ই করো, আমাদের বন্ধুত্বের শপথ করে বলছি, এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। কিচ্ছু জানি না। সত্যি বলছি। এবার দয়া করে খুলে বলো কি হয়েছে।'

এবার চেরনোভস্কি বিস্মিত হলেন। কারণ তাঁরও জানা আছে, চীফকে না জানিয়ে তারই অঙ্গ সংগঠনে হাত দেয়ার কারও উপায় নেই। কয়েক মুহূর্ত আহাম্মকের মত চেয়ে থাকলেন জেনারেল বন্ধুর দিকে। 'বেশ,

শোনো। প্রথম দিন দুই হারামজাদা এল আমার অফিসে, সেন্ট্রাল কমিটির অনুমোদন নিয়েই। বলল, আমার সেরা ইল্লিগ্যালটিকে তাদের চাই। ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও কমিটির নির্দেশ, কি করব, দিয়ে দিলাম। ভেবে দেখো, যাকে আমি নিজে বছরের পর বছর ট্রেনিঙ দিয়েছি ভবিষ্যতে বড় কোন কাজে লাগানোর আশায়, এক কথায় দিয়ে দিতে হলো তাকে।'

'তারপর?'

'ভাবলাম, আপদ বিদেয় হয়েছে। কিন্তু দুদিন পর আবার হাজির ওরা।'

'কারণ?'

'আমার সেরা "লিজেণ্ড" ওদের চাই,' টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিলেন মেজর জেনারেল। 'দশ বছরেরও বেশি লেগেছে আমার ওই কভার স্টোরি ফুলপ্রুফ করতে, জানো?'

কোনটা কি, জানা আছে ভ্যাসেলিয়েভিচ বরিসভের। এক সময় তিনিও ছিলেন 'এস.'-এর প্রধান পদে। এসব তখন তাঁকেও করতে হয়েছে। ধীরস্থির গলায় জানতে চাইলেন, 'কাকে দিয়েছ ওদের?'

'কাকে আবার, মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে! মনে আছে তোমার ওর কথা?'

নীরবে মাথা দোলালেন বরিসভ, আছে। বেশিদিন নয়, মাত্র বছর দুয়েক তিনি 'এস'-এর প্রধান ছিলেন। তবু, এখনও ভ্যালেরিকে মনে আছে তাঁর। অন্যদের কথাও। 'ইনডেন্টগুলোর অথরিটি কে ছিল?'

'টেকনিক্যালি সেন্ট্রাল কমিটি। তবে রেটিং...।' ডান হাতের তর্জনি তুললেন তিনি সিলিঙের দিকে।

কি বোঝাতে চাইছেন বন্ধু, বুঝে নিলেন বরিসভ পলকে। 'ঈশ্বর?'

'কাছাকাছি,' মুখ বিকৃত করলেন চেরনোভস্কি। 'আমাদের প্রিয় জেনারেল সেক্রেটারি। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'হুঁম! আর কিছু?'

'অনেক কিছু। আবারও এসেছিল ওরা।'

'কি চাইল সেবার?'

'চার বছর আগে তুমি ব্রিটেনে যে গোপন ট্র্যান্সমিটারগুলো স্থাপন করে রেখে এসেছিলে, তার একটা রিসিভার ক্রিস্ট্যাল। এই কারণেই আমি ভেবেছি তুমি এর পিছনে না থেকে পারো না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল জেনারেল বরিসভের। যখন ইল্লিগ্যালস-এর প্রধান ছিলেন তিনি, ন্যাটো তখন ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে পার্সিং টু এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বাড়িয়েই চলেছে আশঙ্কাজনক হারে। এ নিয়ে পলিট ব্যুরোর দুশ্চিন্তা দিন দিন বেড়ে চলছে, ঘন ঘন মীটিঙে বসছে ব্যুরোর সদস্যরা।

এরপর এক সময় তাদের নির্দেশ এল, পশ্চিম ইউরোপে নাশকতামূলক অপারেশন চালানোর জন্যে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রস্তুত করতে হবে অপারেশনের ক্ষেত্র। কন্টিঞ্জেন্সি প্ল্যান তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে যাতে সংক্ষিপ্ততম সময়ের নোটিসে পুরো পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র যুগপৎ কার্যকর করা যায় প্ল্যানগুলো।

ওই নির্দেশের ভিত্তিতেই সে অঞ্চলে অনেকগুলো ক্ল্যানডেস্টাইন রেডিও ট্র্যান্সমিটার স্থাপন করেছিলেন জেনারেল বরিসভ। ওর মধ্যে তিনটে বসানো হয় ব্রিটেনে। মস্কো থেকে পাঠানো যে কোন বার্তা গ্রহণ করতে সক্ষম অত্যাধুনিক সেট ওগুলো। ওদের মাধ্যমে পাঠানো বার্তার বক্তব্য ধারেকাছে অবস্থানরত কেজিবির কোন এজেন্টকে উদ্ধার করতে হলে বিশেষভাবে তৈরি ক্রিস্ট্যাল রিসিভার ব্যবহার করতে হবে। কোডেড বার্তা ডি-কোড করে দিয়ে তার সময় ও পরিশ্রম, দুটোই বাঁচিয়ে দেয় এই রিসিভার। অবশ্যই তাকে 'প্রোগ্রামড্' ক্রিস্ট্যাল হতে হবে। এগুলো সব

সময় 'এস'-এর স্টোরে, কড়া নিরাপত্তার মাঝে রাখা হয়।

ট্র্যান্সমিটারগুলোর প্রহরার দায়িত্বে ইউরোপে রয়েছে যে সব কেজিবি এজেন্ট. তারা সবাই 'স্লীপার'। জেগে জেগে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম তখনই ভাঙবে, যখন আর কোন এজেন্ট তাদের সামনে সঠিক আইডেন্টিফিকেশন কোডটি উচ্চারণ করবে।

'রিসিভার কোনটা নিয়ে গেছে,' যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি, এমনভাবে জানতে চাইলেন বরিসভ।

'যেটার নাম তুমি দিয়েছিলে পপলার।'

মাথা দোলালেন এফসিডি প্রধান। নিজ হাতে ব্রিটেনেরগুলো স্থাপন করেছিলেন তিনি। কোথায় কোনটা আছে, কোনটার কোড নেম কি, ওগুলোর পাহারায় যারা রয়েছে, তাদের কার কি নাম, কি কোড নেম, কোড নম্বর, সব আজও পরিষ্কার মনে আছে তাঁর। তিনটেই লণ্ডন ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বসানো আছে। অন্য দুটোর নাম হ্যাকনি এবং সোরেডিচ্। 'আরও কিছু, স্টারেট?'

'হ্যাঁ। মেজর ক্রিপচেঙ্কোকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ডিপার্টমেন্ট 'ভি' বা এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনে ছিল মেজর এক সময়। এখন কিসে আছে জানেন না জেনারেল। 'এর স্পেশালিটি কি?'

'ক্ল্যানডেস্টাইন প্যাকেজ এদেশ ওদেশ আনা-নেয়া করা।'

'মানে স্মাগলিঙ?'

'হ্যাঁ। পশ্চিম ইউরোপের সবগুলো বর্ডার পয়েন্ট তার নিজ হাতের তালুর মতই পরিচিত। জানে কি করে কাস্টমস্ আর ইমিগ্রেশনকে পাশ কাটানো সম্ভব।'

'তোমাকে প্রথমেই বলেছি, স্টারেট, আমি এর কিছুই জানি না। এ আমার অপারেশন নয়, বিশ্বাস করো। কোন সন্দেহ নেই; এটা অনেক

ওপরের মহলের কাজ। তোমার-আমার ধরাছোঁয়ার বাইরের। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা বিপদ ডেকে আনতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করো, লোকসানের কথা ভুলে যাও। আমি খোঁজ-খবর কিছু বের করতে পারি কি না, দেখব। তুমি একদম চেপে যাও সব। ডু নাথিং, সে নাথিং।'

'ঠিক আছে।'

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন এফসিডি চীফ। একেবারে আচমকা চিন্তাটা ঢুকল তাঁর মাথায়। গত প্রায় দুই সপ্তাহ দেখা নেই জিআরইউ প্রধান জেনারেল মার্চেঙ্কোর। কেন? কোথায় তিনি? এর সঙ্গে তাঁর কি কোন যোগসাজশ আছে? জানালার কাঁচ ইঞ্চি খানেক নামিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগালেন জেনারেল কিছুক্ষণ। প্রশ্নটা মাথা গরম করে তুলেছে।

কালই এ ব্যাপারে পুরোপুরি খোঁজ নেবেন তিনি গোপনে। তাঁকে না জানিয়ে কোথায় কি ঘটতে চলেছে, জানার পুরো অধিকার রয়েছে কেজিবির 'ইল্লিগ্যালস তথা এস' ডিরেক্টরেট প্রধানের।

নয়

সুইডিশ পাসপোর্ট নিয়ে একেবারে নির্বিবাদে ইংল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। অ্যারোফ্লোটে প্রথমে জুরিখ পৌঁছল সে মস্কো থেকে। কাস্টমস ঝামেলা চুকিয়ে চলে এল কনকোর্সে। তারপর সুইডিশ পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি একটা খামে পুরে স্থানীয় কেজিবির

এক সেফ হাউসের ঠিকানায় পোস্ট করে দিল।

এয়ারপোর্টেই বেনামে ভাড়া করা কেজিবির এক পোস্ট বক্সে আগে থেকে রাখা ছিল তাতায়েভের নতুন পরিচয় পত্র, বের করে নিল সে ওটা। সুইস কম্পিউটর এঞ্জিনিয়ারের পরিচয় আছে ওতে। ঘণ্টাখানেক পর কানেকটিং ফ্লাইটে ডাবলিনের উদ্দেশে উড়াল দিল তাতায়েভ। একই বিমানে রয়েছে তার এসকর্ট। সে অবশ্য জানে না কাকে এসকর্ট করছে সে। খুব কাছাকাছিই রয়েছে দুজনে, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। ছক যে ভাবে বাঁধা, তাতে চেনারও অবশ্য প্রয়োজন পড়ে না।

ডাবলিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হোটেলের এক রুমে মিলিত হলো তারা নির্ধারিত সময়। কোন কথা হলো না দুজনের মধ্যে। নীরবে পরনের ইউরোপিয়ান কাপড়-চোপড়, জুতো-মোজা মায় জাঙ্গিয়া পর্যন্ত সব খুলে ফেলল তাতায়েভ। ওগুলো নিজের হাতব্যাগে ভরল এসকর্ট। তার আগেই ওর ভেতর থেকে মেজরের জন্যে নিয়ে আসা ব্রিটিশ পোশাক, জুতো ইত্যাদি বের করে রেখেছে সে।

এরপর বড়সড় একটা লেদার স্যুটকেস এগিয়ে দিল লোকটা মেজরের দিকে। ওর মধ্যে রয়েছে নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ এটা-ওটা। হোটেল রুমে আসার আগে, এয়ারপোর্টের মেসেজ বোর্ডে পিন দিয়ে গেঁথে রাখা একটা খাম সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে সে। কল্পিত এক নাম লেখা ছিল খামের ওপরে। ভেতরে আগের রাতের এলবানা থিয়েটারের একটা টিকেটের দর্শকের অংশ, নিউ জুরি'স হোটেলে রাত কাটানোর রিসিট এবং এয়ের-লিঙ্গাসের লণ্ডন-ডাবলিন-লণ্ডন রুটের একটা টিকেট ছিল, যার 'আপ' ব্যবহার করা হয়েছে, ডাউন বহাল।

এবং ভ্যালেরি তাতায়েভের নতুন পাসপোর্ট। বিশাল ল্যাভেটরির ভেতরের এক সিঙ্কের তলায় স্কচ্ টেপ দিয়ে আটকানো ছিল, ওটাও সংগ্রহ

করে নিয়ে এসেছে এসকর্ট। তৈরি হয়ে যখন কনকোর্সে ফিরে গেল তাতায়েভ, কেউ ভাল করে তাকালই না তার দিকে। ডাবলিনে একদিনের বিজনেস ট্রিপ সেরে লণ্ডন ফিরে চলা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের দলে ভিড়ে মিলেমিশে গেছে সে।

ডাবলিন-লণ্ডন রুটে পাসপোর্ট চেকিঙের ঝামেলা নেই, লণ্ডন পৌঁছে যাত্রীকে কেবল বোর্ডিং পাস বা টিকেটের অবশিষ্টাংশ দেখালেই মামলা খতম। হিথ্রোর এক্সিটওয়েের দু' পাশে স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুজন দাঁড়িয়ে আছে উদাস ভঙ্গিতে। দেখলে মনে হবে কিছুই দেখছে না। আসলে প্রায় কোনকিছুই তাদের চোখ এড়ায় না।

নিশ্চিন্ত মনে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এল ভ্যালেরি তাতায়েভ। এই প্রথম ভ্যালেরিকে দেখছে তারা, তবু কিছু জিজ্ঞেস করল না। করলে দেখতে পেত মার্টিন ফ্ল্যানারি একজন খাঁটি ইংলিশম্যান। অন্তত তার পাসপোর্টে সেরকমই বলত। এবং ওটা মোটেই জাল নয়, খোদ লণ্ডন পাসপোর্ট অফিস থেকে ইস্যু করা। কাস্টমস পেরিয়ে এল মেজর বিনা চেকিঙে। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল কিংস ক্রস স্টেশনের দিকে। ওখানকার লেফট-লাগেজ লকারে তার জন্যে রাখা আছে একটা সীলড্ প্যাকেট। দু'দিন আগে মস্কো থেকে এসেছে ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে, লণ্ডনের রুশ দূতাবাসে।

দূতাবাসের কেজিবির এক অপারেটর প্যাকেটটা রেখে গেছে লকারে। বেনামে ভাড়া নিয়ে রাখা কেজিবির এরকম অসংখ্য লকার, পোস্ট বক্স আছে এদেশে। প্রতিটির ডজন খানেক করে চাবি রয়েছে, নকল করে বানিয়ে নিয়েছে নিজেরা। ওর একটা ভ্যালেরির কাছেও আছে। প্যাকেটটা হ্যাণ্ডগ্রিপে ভরে ফেলল ভ্যালেরি। ভেতরে কি আছে দেখার তাড়া নেই। সে জানে কি আছে ওতে। কাজেই পরে দেখলেও চলবে।

ওখান থেকে আরেকটা ট্যাক্সি চেপে লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে এল সে।

টিকেট কেটে উঠে পড়ল সাফোক কাউন্টির ইপসুইচ্গামী ট্রেনে। সন্ধে ঠিক সাতটায় সেখানকার গ্রেট হোয়াইট হর্স হোটেলে চেক ইন করল ভ্যালেরি তাতায়েভ। ট্রেনে যদি কোন পুলিস চেক করতে চাইত তার হ্যাণ্ডগ্রিপ, নিঃসন্দেহে চোখ কপালে উঠত তার।

লকার থেকে সংগ্রহ করা প্যাকেটের ভেতর নিরীহ বেড়ালছানার মত শুয়ে রয়েছে একটা ফিনিশ সাকো অটোমেটিক পিস্তল। সঙ্গে পুরো একটা ম্যাগাজিন। প্রতিটি বুলেটের সূঁচোল অগ্রভাগ খুব সতর্কতার সঙ্গে ইংরেজি X এর মত করে কাটা। কাটা অংশটুকু ভরাট করা আছে সিরিশ আঠা ও পটাশিয়াম সায়ানায়িডের মিকশ্চার দিয়ে। কেবল আহতই করবে না ওই বুলেট। যার দেহে বিঁধবে, মিকশ্চারের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু তার অবধারিত। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এছাড়া একটা কভার স্টোরি বা লিজেণ্ডও আছে গ্রিপের ভেতর। মার্টিন ফ্ল্যানারির 'লিজেণ্ড'। যে ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই নেই, তার জীবন বৃত্তান্তকে বলা হয় 'লিজেণ্ড'। যা প্রস্তুত করা প্রচুর ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের ব্যাপার। অস্তিত্বহীন ব্যক্তিটির প্রতিটি বানানো কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে প্রয়োজন হয় হাজারো খুঁটিনাটি, বর্ণনা, সাপোর্টিং ডকুমেন্টস ইত্যাদি।

আসলে এই 'অস্তিত্বহীন' ব্যক্তিটির অস্তিত্ব কোন একসময় ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে, পরিবেশে, মৃত্যু ঘটেছে তার সবার অজান্তে। পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে সে নীরবে, নিভৃতে। ঠিক এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে দুনিয়ার সব বড় বড় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। মরা মানুষটিকে বাঁচিয়ে তোলে ওরা। প্রয়োজনে কাজে লাগাবার উদ্দেশে।

আসল মার্টিন ফ্ল্যানারির মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই, ১৯৭৬ সালে।

জাম্বেজি নদীর দক্ষিণ তীরের গভীর জঙ্গলে পড়ে আছে তার মৃতদেহ অথবা কঙ্কাল যাই হোক। স্কটল্যাণ্ডের কিলব্রাইডে ১৯৫০ সালে জন্ম হয়েছিল মার্টিন ফ্ল্যানারির। বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের অপর্যাপ্ত রেশনিং সিস্টেমের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার বাবা, মারিয়াস ফ্ল্যানারি এবং মা জুলিয়ান ফ্ল্যানারি একমাত্র সন্তান মার্টিনকে নিয়ে তৎকালীন দক্ষিণ রোডেশিয়ায় অভিবাসন গ্রহণ করেন, ১৯৫১ সালে।

মারিয়াস ফ্ল্যানারি ছিলেন কৃষি প্রকৌশলি। একটা চাকরি সেখানে জুটিয়ে নিতে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। নয় বছর চাকরি করার পর, ১৯৬০ সালে ব্যবসা শুরু করেন ভদ্রলোক। মোটামুটি ভালই চলছিল। ১৯৭১ সাল। ছেলে ততদিনে স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। পড়ছে নামকরা মাইকেলহাউস কলেজে। দেশে তখন তুমুল রাজনৈতিক অসন্তোষ। রোডেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আয়ান স্মিথকে গদিচ্যুত করতে জশুয়া নকোমোর 'যিপ্রা' (জেড আই পি আর এ) এবং রবার্ট মুগাবের 'যানলা' (জেডএএনএলএ), এই দুই গেরিলা বাহিনী বদ্ধপরিকর। চারদিক থেকে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে তারা। তাদের বেপরোয়া অগ্রাভিযান দেখে সরকারী বাহিনী দিশেহারা।

আইন করা হলো দেশের প্রতিটি সক্ষম যুবককে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। বাধ্য হয়ে কলেজ ত্যাগ করতে হলো মার্টিনকে। রোডেশিয়ান লাইট ইনফ্যান্ট্রিতে নাম লেখাল সে। এর কয়েক বছর পর ১৯৭৬ সালে, জাম্বেজির দক্ষিণ তীরে যিপ্রা বাহিনীর অ্যামবুশের মাঝে পড়ে যায় মার্টিন এবং নিহত হয়।

মারা যাওয়ার সময় মার্টিনের সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র ছিল না। ছিল তার মেয়ে বান্ধবীর পাঠানো একটা চিঠি। কমব্যাট জ্যাকেটের পকেটে ছিল চিঠিটা। পরে জাম্বিয়া নিয়ে আসা হয় চিঠিটা আরএলআই হেডকোয়ার্টার্সে

জমা দেয়ার জন্যে। একদিন সেটা গায়েব হয়ে যায় এবং কেজিবির হাতে পড়ে।

সে সময় লুসাকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ছিল কেজিবির সিনিয়র এক অফিসার, ভ্যাসিলি সলোদভনিকভ। আফ্রিকার দক্ষিণাংশের দেশগুলোতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করত সে। চিঠিটা মার্টিনের বান্ধবী লিখেছিল তার শহরের ঠিকানায়, মারিয়াস ফ্ল্যানারির কেয়ারে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাপ-ছেলে জন্মগতভাবে ব্রিটিশ।

ব্যাপারটাকে বোনাস হিসেবে ধরে নিল সলোদভনিকভ। রোডেশিয়ায় থাকলেও তাদের দুজনেরই ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে। ওগুলো সমর্পণ করেনি মারিয়াস বা মার্টিন। অতএব 'লিজেণ্ড' তৈরির কাজে লেগে পড়ল সে, বেঁচে উঠতে হলো মার্টিন ফ্ল্যানারিকে।

স্বাধীনতা পেয়ে রোডেশিয়া হলো জিম্বাবুয়ে। মনের দুঃখে মারিয়াস এবং জুলিয়ান সে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু ছেলে, মার্টিন, 'ব্রিটেনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল'। অদৃশ্য এক হাত লণ্ডনের সমারসেট হাউসে সংরক্ষিত মার্টিনের বার্থ সার্টিফিকেটটা সরিয়ে ফেলল। অন্য আরেক হাত তার নাম ঠিকানার ওপর ভিত্তি করে নতুন একটা পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত পাঠাল ডাক মারফত। দরখাস্ত পরীক্ষা করে দেখা হলো, এরপর মার্টিন ফ্ল্যানারির পাসপোর্ট পেতে দেরি হলো না বিশেষ।

নিখুঁত, ফুলপ্রুফ লিজেণ্ড প্রস্তুতের কাজে প্রয়োজন হয় 'অতি বিশেষ' যত্নের। প্রচুর সাহায্যকারী এবং অর্থের। সেই সঙ্গে সময়। প্রথম দুটোর অভাব কেজিবির কখনও ছিল না, ছিল না ধৈর্যের অভাবও। একেকটা লিজেণ্ডকে নিখুঁত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে কখনও কখনও অবিশ্বাস্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কেজিবি। যেমন করেছে মার্টিন ফ্ল্যানারির ব্যাপারে—এতে লেগেছে প্রায় দশ বছর।

'দেশে ফিরে এসে' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে ফ্ল্যানারি। সময় শেষ

হওয়ার আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স রিনিউ করিয়েছে নিয়মিত। বেশ কয়েকটা গাড়ি তার নামে কেনাবেচা হয়েছে যাতে ভেহিকেল লাইসেন্সিং সেন্টার কম্পিউটর চেক করলেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। কেজিবির এক দঙ্গল জুনিয়র স্টাফ নিষ্ঠার সাথে ফ্ল্যানারিকে বাঁচিয়ে রেখেছে লণ্ডনের কাগজে-কলমে।

আরও আছে। লিজেণ্ডারি চরিত্রটির অতীত জানতে লেগে পড়ে আরেক দল। তার ডাকনাম কি ছিল? শিশুকালে বাপ-মা আদর করে তাকে কি বলে ডাকত? কোন প্রিপারেটরিতে প্রথম ভর্তি হয়েছে সে, তারপর কোন স্কুল, কলেজ? স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষককে পিছন থেকে কি বলে খেপাত সে? তার কুকুরের কি নাম ছিল? কবে বাথরুমে আছাড় খেয়ে তার থুতনি কি আর কোথাও কেটে গিয়েছিল?

ঠিক এমনি এক সন্দেহাতীত লিজেণ্ড বহন করছে ভ্যালেরি তাতায়েভ তার মাথায় এবং হ্যাণ্ডগ্রিপে। সে-ই মার্টিন ফ্ল্যানারি, প্রমাণ করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না। ডরসেটের ডরচেস্টার থেকে এসেছে সে, একটি সুইস বেজড্ কর্পোরেশন মার্কেটিং কম্পিউটর সফটওয়্যার কোম্পানির নতুন শাখা খুলতে। ডরচেস্টারের বারক্লেজ ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা আছে মার্টিন ফ্ল্যানারির। দুয়েক দিনের মধ্যেই টাকাটা কলচেস্টারে ট্র্যান্সফার করতে যাচ্ছে সে।

ব্রিটেন এমনই এক দেশ, যে দেশে কোন ইংলিশম্যানের পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে ঘোরার প্রয়োজন পড়ে না। ড্রাইভিঙ লাইসেন্স, নিদেন তাকে উদ্দেশ করে লেখা কোন চিঠি, যথেষ্ট। অতএব, এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই, গ্রেট হোয়াইট হর্স হোটেলে রাজকীয় ডিনার সেরে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ভাবল মেজর ভ্যালেরি আলেক্সেইভিচ তাতায়েভ। রিসেপশন ডেস্ক থেকে ইয়েলো পেজ ডাইরেক্টরিটা রুমে আনিয়ে নিল সে।

খুঁজে বের করল এস্টেট এজেন্ট সেকশন।

*

'এবার?' প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। 'কোত্থেকে আরম্ভ করতে চান নতুন করে, মেজর?'

'এখান থেকে,' ডি অ্যাঙ্গাসের জীবন বৃত্তান্তের এক জায়গায় দুটো টোকা দিল মাসুদ রানা। 'ওরা দুজন ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ার পর থেকে। দ্বিতীয় সৈনিকটির ব্যাপারে কিছু তথ্য চাই।'

'দ্বিতীয় সৈনিক?'

'যে অ্যাঙ্গাসকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়েছিল ট্রাক থেকে।'

'কিন্তু সে তো মৃত!'

'জানি,' অন্যমনস্কের মত বলল রানা। 'কেবল 'সঙ্গী' বলে তার উল্লেখ করেছে অ্যাঙ্গাস এখানে, নাম কি ছিল, লেখেনি। কেন?'

'হতে পারে প্রয়োজন মনে করেনি।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হতে পারে।'

'অথবা হয়তো জানিয়েছিল কাউকে।'

'সৈনিকটির পরিচয় জানতে হবে,' যেন শুনতে পায়নি ক্যাপ্টেনের বক্তব্য, এমন ভাবে বলল রানা।

'তা কি করে সম্ভব, মেজর? মাইণ্ড ইট, কয়েক দশক আগে মারা গেছে লোকটা। কোন পোলিশ ফরেস্টে পুঁতে ফেলা হয়েছে তার লাশ। এত বছর পর সেই স্থানটিই বা লোকেট করব কিভাবে?'

'অ্যাঙ্গাসের মতে ১৯৪৪ সালের বড়দিনের ঠিক দু'দিন আগে জার্মান অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছিল তার ইউনিট, স্টালাগ থ্রী ফোর ফোর। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'এই স্টালাগের কেউই কি বেঁচে নেই? নিশ্চয়ই আছে।'

'পেয়েছি,' মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন পিয়েনারের।

'যুদ্ধফেরত প্রাক্তন সৈনিকদের একটা সংগঠন আছে, 'অর্ডার অভ টিন হ্যাটস'। এর সদস্যদের বলা হয় মথ। গোটা ছয়েক শাখা আছে এর। ওদের কাছে খোঁজ নেয়া যেতে পারে।'

খুব উৎসাহ নিয়ে টেলিফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পিয়েনার। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই সব উৎসাহ-উদ্দীপনা তার উবে গেল কর্পূরের মত। 'নাহ, হলো না। কেউ কোন সঠিক তথ্য দিতে পারছে না, উল্টোপাল্টা বলে। দেখি, সবাইকে ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছি। অনুরোধ করেছি খোঁজ-খবর নিয়ে সম্ভব হলে জানাতে। দেখি কি হয়।'

'প্রিটোরিয়ায় ক'টা টিন হ্যাটস্ আছে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'দুটো।'

আসন ছাড়ল ও। 'চলুন, ঘুরে আসি ওদের ওখান থেকে।'

'যাবেন? চলুন।'

দরজা খুলেছে রানা বেরিয়ে পড়ার জন্যে, এমন সময় ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোন। থেমে পড়ল ও, রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করেছে পিয়েনার। দুর্বোধ্য ভাষায় গড় গড় করে কী সব বলছে। বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনকে। ভুরু কুঁচকে দোড়গোড়ায় অপেক্ষা করছে রানা।

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ঘুরে তাকাল অ্যানড্রিয়াস। 'কেপ টাউন থেকে ফোন করেছে এক লোক। বলছে, স্টালাগ থ্রী ফোর ফোরে ছিল সে।'

দ্রুত ডেস্কের কাছে ফিরে এল মাসুদ রানা। 'ইংরেজি জানে?'

'হ্যাঁ। লোকটা অ্যাংলো,' রিসিভার ধরিয়ে দিল সে ওর হাতে।

'হ্যালো! মিস্টার হেণ্ডারসন? হ্যাঁ, আমার নাম মাসুদ রানা। আপনাদের স্টালাগ থ্রী ফোর ফোর নিয়ে রিসার্চ করছি আমি...ধন্যবাদ, অনেক দয়া আপনার...হ্যাঁ। ওয়েল, ১৯৪৪ সালের বড়দিনের কথা মনে আছে আপনার, মিস্টার হেণ্ডারসন? জার্মান অ্যামবুশের ভেতর পড়ে দুই

আফ্রিকান সৈনিক ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে…অ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের কথাই বলছি। ওদের নাম মনে আছে আপনার? নেই, না? ওয়েল, আপনাদের ইউনিটের সিনিয়র সাউথ আফ্রিকান এনসিও কে ছিলেন বলতে পারেন? আই সী. ওয়ারেন্ট অফিসার অ্যান্থনি!…ওয়ালি অ্যান্থনি? ঠিক মনে আছে আপনার? অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

রিসিভার রেখে দিল রানা। ওয়ারেন্ট অফিসার ওয়ালি অ্যান্থনি, ভাবল ও, সম্ভবত ওয়াল্টার অ্যান্থনি। 'আপনাদের মিলিটারি আর্কাইভে যেতে চাই।'

টোয়েন্টি ভিসাজি স্ট্রীটে কফি রঙের চারতলা এক ভবন, সাউথ আফ্রিকান মিলিটারি আর্কাইভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও অনেক বছর ইংরেজির চল ছিল এদেশের সরকারি কাজকর্মে। পুরো তালিকা ইংরেজিতে লেখা। ওতে একশোরও বেশি অ্যান্থনি আছে। প্রথম অক্ষর ডব্লিউ পাওয়া গেল তার মাত্র উনিশ জনের। মেলে না।

খানিকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে বুঝল রানা, এভাবে হবে না। এ. থেকে ক্রমানুসারে চেক করতে শুরু করল ও ভেবেচিন্তে। ঝাড়া এক ঘণ্টা লাগল নামটা বের করতে। জেমস ওয়াল্টার অ্যান্থনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ওয়ারেন্ট অফিসার ছিলেন। উত্তর আফ্রিকার তবরুক ফ্রন্টে ধরা পড়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের বাকি সময় ইটালি এবং জার্মানিতে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে।

১৯৭২ সালে অবসর নেয়ার আগে কর্নেল পর্যন্ত পদোন্নতি হয় অ্যান্থনির।

'প্রার্থনা করুন মানুষটা যেন বেঁচে থাকে,' বলল পিয়েনার।

'এর ঠিকানা সম্ভবত আপনাদের পেনশন ডিপার্টমেন্ট দিতে পারবে।'

হ্যাঁ, জানা গেল নিয়মিত পেনশনের টাকা তুলছেন কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) জেমস ওয়াল্টার অ্যান্থনি। জোহান্সবার্গের একশো মাইল দক্ষিণে অরেঞ্জভিল নামে ছোট এক শহরে সস্ত্রীক থাকেন তিনি। খুশি মনে

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা আর অ্যাণ্ড্রিয়াস পিয়েনার। রাত নেমেছে একটু আগে। সিদ্ধান্ত নিল রানা, কাল ভোরে রওনা হবে অরেঞ্জভিল।

চারদিক লেক আর ঘন গাছ-গাছালি ঘেরা ছিমছাম শহর। কর্নেলের বাড়ি ছোট এক টিলার ওপর, দূর থেকে ছবির মত লাগে। দরজা খুললেন মিসেস অ্যান্থনি। ক্যাপ্টেন পিয়েনারের পরিচয়পত্রের ওপর নজর বোলালেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে। তারপর বললেন, 'ওদিকে,' হাত তুলে পশ্চিম দিক নির্দেশ করলেন বৃদ্ধা। 'লেকের পাড়ে পাবেন তাকে। মাছ ধরছে।'

কর্নেলও বেশ অনেকক্ষণ ধরে উল্টেপাল্টে পরখ করে দেখলেন কার্ডটা। তারপর ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'কি জানতে চান।'

ছিয়াত্তর বছর বয়স কর্নেলের। কিন্তু দেহের শক্ত বাঁধুনি এখনও বহাল। পরনে টুইড, কড়া পালিশ দেয়া ঝকঝকে কালো শু। 'হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে আছে সব।'

'ওদের দুজনের নাম মনে আছে আপনার, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই। একদিনের পরিচিতের নামও মনে করতে ভুল হয় না আমার কখনও। দুজনেই অল্পবয়সী ছিল ওরা, আফ্রিকানার। একজন ডি অ্যাঙ্গাস। অন্যজন কর্পোরাল ফ্রিক্কি। ফ্রিক্কি ব্রান্ট।'

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রিটোরিয়া ফিরে এল ওরা। আবার এল মিলিটারি আর্কাইভে। ফ্রিক্কি অর্থাৎ ফ্রেডারিখ। এর সঙ্গে যে ব্রান্ট, তার শেষে একটা টি আছে বাড়তি। একটা খুব কমন ডাচ নাম। সুদীর্ঘ সাধনার পর আর্কাইভের এক কর্মচারীর সহায়তায় ছয়জন কর্পোরাল ফ্রেডারিখ ব্রান্টের নাম পাওয়া গেল। তাদের কেউই বেঁচে নেই আজ।

ফাইলগুলো এক এক করে চেক করতে লাগল মাসুদ রানা। দু'জন মারা গেছে উত্তর আফ্রিকা রণাঙ্গণে। দু'জন ইটালিতে। বাকি দু'জনের একজন

ল্যাণ্ডিং ক্র্যাফটের সঙ্গে আটলান্টিকে ডুবে, অন্যজন…। ষষ্ঠ ফাইলের মোড়ক উল্টে স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা।

'একি!' বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে পিয়েনার ফাইলটার দিকে। 'কে করল এ কাজ?'

'কে জানে।' শূন্য দৃষ্টিতে ফাইল দেখছে রানা। 'যে-ই হোক, বহু বছর আগেই ঘটেছে হাত সাফাইটা।'

ভেতরটা শূন্য। কিচ্ছু নেই ফাইলে।

'দুঃখিত। মনে হচ্ছে এখানেই পথের শেষ।'

কোন উত্তর দিল না মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে বেরিয়ে এল আর্কাইভ থেকে। হোটেলে ফিরে কর্নেল (অব:) জেমস অ্যান্থনির নাম্বারে টেলিফোন করল।

'আপনাকে আবার বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত, কর্নেল।'

'দ্যাটস অল রাইট, ইয়াংম্যান। বলুন, কি সাহায্য করতে পারি।'

'কর্পোরাল ফ্রিক্কি ব্রান্টের কোন মেট বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল কি না, মনে করতে পারেন, কর্নেল? আর্মিতে আমার নিজ অভিজ্ঞতায় জানি, প্রত্যেকেরই একজন ক্লোজ মেট থাকে।'

'ঠিকই বলেছেন। থাকে। কিন্তু দুঃখিত, এই মুহূর্তে খেয়াল পড়ছে না। এ নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম আমি, মেজর। মনে পড়লেই জানাব আপনাকে। সে, কাল সকালে?'

'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ, কর্নেল। নামটা পেলে খুব সুবিধে হয় আমার।'

'চিন্তা করবেন না। পেয়ে যাবেন।'

সকাল আটটায় এল বহু কাঙ্ক্ষিত টেলিফোন। 'মনে পড়েছে, মেজর। আরেক কর্পোরাল ছিল ওর মেট। হ্যারিসন, জেমস হ্যারিসন। আর ডিএলআই।'

'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'রয়্যাল ডারবান লাইট ইনফ্যানট্রি।'

ফোন করে অ্যানড্রিয়াসকে আর্কাইভে আসতে বলে ছুটল রানা ট্যাক্সি চেপে। এবার মাত্র পনেরো মিনিট সময় ব্যয় হলো। ফাইল পড়ে জানা গেল হ্যারিসনের জন্ম ডারবানে। যুদ্ধের পর চাকরি ছেড়ে দেয় কর্পোরাল, কাজেই পেনশন পায় না সে। ঠিকানাও নেই।

ডারবানের টেলিফোন ডিরেক্টরি নিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। ক্যাপ্টেন পিয়েনার ওখানকার পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে হ্যারিসনের ঠিকানা বের করার অনুরোধ জানাল। উত্তরের আশায় বসে থাকল ফোনের পাশে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর জেমস হ্যারিসনের নামে ইস্যু করা দুটো পার্কিং টিকেট উদ্ধার করল ডারবান পুলিস। ওতে তার ঠিকানা ফোন নাম্বার আছে, জানিয়ে দিল তারা পিয়েনারকে।

'পরিষ্কার মনে আছে ফ্রিক্কির কথা,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জবাব দিল হ্যারিসন। '...হ্যাঁ, হ্যাঁ। জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। না, আর কখনও দেখা হয়নি তার সঙ্গে।'

'সার্ভিসে কোত্থেকে এসেছিল ফ্রিক্কি, জানেন?' প্রশ্ন করল পিয়েনার।

'ইস্ট লণ্ডন।'

'তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'তেমন কিছু না,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল হ্যারিসন। 'পরিবারের ব্যাপারে খুব একটা কিছু বলত না ও। তবে একবার যেন...মনে পড়েছে! একবার শুনেছিলাম, ওর বাবা ওখানকার রেলওয়ে ইয়ার্ডের শান্টার ছিল। এইটুকুই।'

'ধন্যবাদ।'

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময় ওদের জোহান্সবার্গ-ইস্ট লণ্ডন ফ্লাইট অবতরণ করল বেন স্কোয়েমেন এয়ারপোর্টে। টার্মিন্যাল ভবনটি ছোটখাট।

নীল এবং সাদা রঙে অপূর্ব দেখতে। ইস্ট লণ্ডন দক্ষিণ আফ্রিকার চার নম্বর বাণিজ্যিক কেন্দ্র। সামনের কার পার্কে ইনসিগনিয়া বিহীন একটা পুলিস কার অপেক্ষায় ছিল। ফোর্ড সেলুন। কনকোর্স থেকে ওদের পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এল ওটার চালক।

'কোনদিকে যেতে হবে, ক্যাপ্টেন?' পিয়েনারকে প্রশ্ন করল সে।

নীরবে পাশে বসা মাসুদ রানার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্স। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং,' বলল রানা।

মাথা দুলিয়ে গাড়ি ছাড়ল চালক। এখানকার রেলওয়ে স্টেশন ফ্লীট স্ট্রীটে। বেশ আধুনিক কমপ্লেক্স। বড় রাস্তার পাশে একসার সবুজ ও ক্রীম রঙের একতলা ভবন—প্রশাসনিক দফতর। ভেতরে পিয়েনারের 'চিচিং ফাঁক' মার্কা পরিচয়পত্র দেখে প্রায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কর্মচারীদের মধ্যে। অবিলম্বে ফিনান্স ডিরেক্টরের কক্ষে ডাক পড়ল ওদের। আগ্রহ নিয়ে রানার বক্তব্য শুনলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন কর্মকর্তা। 'প্রতিটি অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীকেই ভাতা দিয়ে থাকি আমরা। আপনার এই লোকের নাম কি যেন বললেন?'

'বলিনি এখনও। তার নাম ব্রান্ট। তবে প্রথম নাম বলতে পারব না, দুঃখিত। লোকটা শান্টার লোকো চালক ছিল অনেক বছর আগে।'

একজন সহকারীকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলেন ডিরেক্টর। বেরিয়ে গেল লোকটা। পনেরো মিনিট পর ফিরে এল একটা পেনশন স্লিপ নিয়ে। ধরিয়ে দিল সেটা বসের হাতে।

'হ্যাঁ। এই যে, পাওয়া গেছে,' বললেন তিনি। 'এই একজনই ব্রান্ট আছে আমাদের তালিকায়। তিন বছর আগে অবসর নিয়েছে। অটো ব্রান্ট।'

'বয়স কত হতে পারে অটো ব্রান্টের?'

চোখ নামিয়ে স্লিপটা দেখলেন ডিরেক্টর। 'তেষট্টি।'

মাথা নাড়ল রানা আপন মনে। ডি অ্যাঙ্গাস আর ফ্রিক্কির বয়স যদি একরকম হয়ে থাকে বা তার কাছাকাছি, এবং বাপ-ছেলের বয়সের ব্যবধান ধরা যায় ত্রিশ বছর, তাহলে এ লোকের বয়স নব্বইয়ের ওপরে হতে হবে। বা ওইরকম। ব্যাপারটা জানাল ও ডিরেক্টরকে। কিন্তু তিনি আর সহকারী নিশ্চিত, তালিকায় আর কোন ব্রান্ট নেই।

'সেক্ষেত্রে দয়া করে, সবচে' বেশি বয়সী তিনজন পেনশনিয়ারের নাম-ঠিকানা দিন আমাকে। যারা এখনও বেঁচে আছে।'

মাথা দোলালেন তিনি। 'সম্ভব নয়। এখানে বয়স নয়, অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে লিস্ট সংরক্ষণ করি আমরা।'

হাত ধরে রুমের এক কোণে টেনে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন ডিরেক্টরকে। নিচু কণ্ঠে গড়গড় করে বলতে লাগল কী সব। হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা ডেস্কে ফিরে এসে। সহকারীর উদ্দেশে বলল, 'খুঁজতে শুরু করো পুরো তালিকা। যত লোক পাও লাগিয়ে দাও সবাইকে। ভদ্রলোকের চাহিদা পূরণ না করে উপায় নেই।'

তিন ঘণ্টা পর তিনটে পেনশন স্লিপ নিয়ে ঘরে ঢুকল লোকটা। 'নব্বই বছর বয়সী একজন পেনশনিয়ারকে পাওয়া গেছে। কিন্তু লোকটা টার্মিন্যাল পোর্টার ছিল। আরেকজনের বয়স আশি। ক্লিনার ছিল। শেষের এই লোক মার্শালিঙ ইয়ার্ডের শান্টার ছিল। বয়স একাশি। নাম কূজ। ফ্রেডরিখ কূজ। কুইগনির কোথাও বাসা তার,' জানালেন কর্মকর্তা।।

শহরের নিম্ন মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা কুইগনি, মূর স্ট্রীটে। বাসাটা খুঁজে পেতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হলো। কিন্তু পাওয়া গেল না ফ্রেডরিখ কূজকে। বাসায় নেই সে। মাঝবয়সী এক লোক জানাল, ইনস্টিটিউটে পাওয়া যাবে তাকে। রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবে।

'ফ্রেডরিখ?' পিয়েনারের প্রশ্ন শুনে বলল ক্লাবের বারম্যান। 'শিওর। ওই যে, ওখানে বসে আছে।'

উদাস ভঙ্গিতে দূরের একসার পাহাড় দেখছে বৃদ্ধ। হাতে বিয়ারের ক্যান। খোলা ব্যালকনিতে বড় একটা রঙচঙে ছাতার নিচে বসা। মাথা দুলিয়ে সায় দেয়ার আগে অ্যানড্রিয়াস পিয়েনারের দিকে চেয়ে থাকল বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত। 'খুব মনে আছে ব্রান্টের কথা। কিন্তু সে তো কবেই মারা গেছে।'

'তার এক ছেলে ছিল ফ্রিক্কি। ফ্রিক্কি ব্রান্ট।'

'ঠিক। গুড হেভেনস্, ম্যান। প্রায় ভুলে যাওয়া অতীত মনে করিয়ে দিলেন আপনি। হ্যাঁ, ফ্রিক্কি। খুব ভাল ছেলে ছিল। স্কুল ছুটির পর মাঝেমধ্যে আসত ইয়ার্ডে। ওর বাবা জো ব্রান্ট ছেলেকে শান্টিং লোকোয় চড়িয়ে ঘোরাত।'

'কতদিন আগের কথা? ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি?'

'হ্যাঁ, হবে হয়তো। জো পরিবার নিয়ে এখানে আসার পরপরই।'

'১৯৪৩ সালের দিকে যুদ্ধে যোগ দিতে যায় ফ্রিক্কি, তাই না?'

আবার উদাস হয়ে গেল বৃদ্ধ। যেন কয়েক দশক পিছনে ফেলে আসা অতীত দেখার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ। আর ফিরল না ছেলেটা। যুদ্ধে পোল্যাণ্ডের কোথায় নাকি মৃত্যু হয়েছে তার। খবর পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল জো। ছেলেই ছিল তার সব। তাকে নিয়ে অনেক আশা-ভরসা ছিল। তারপর···টেলিগ্রামে ফ্রিক্কির মৃত্যু-সংবাদ শোনার অল্প কয়েক বছর পর জো'রও মৃত্যু হলো। পঞ্চাশ সালে। লোকটার দুঃখের কথা মনে পড়লে এখনও কষ্ট হয়। এরপর তার বউটাও মরল।'

'একটু আগে আপনি বললেন, ''জো পরিবার নিয়ে এখানে আসার পরপরই''। কোত্থেকে এসেছিলেন জো? দক্ষিণ আফ্রিকার কোন অংশ থেকে?' মাসুদ রানা প্রশ্ন করল। অনুবাদ করে দিল পিয়েনার।

মুখ দেখে মনে হলো যেন অবাক হলো ফ্রেডরিখ কুজ। 'দক্ষিণ আফ্রিকা!'

'তারা তো আফ্রিকানার ছিল, তাই না?' মৃদু কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন।

আরও অবাক হলো বৃদ্ধ। 'কে বলেছে আপনাদের?'

'আমরা তো তাই জানি। তাছাড়া আর্মির রেকর্ডেও সেরকমই লেখা।'

'ও, বুঝেছি,' হাসল লোকটা। 'ফ্রিক্‌কি চালাকি করেছে। আফ্রিকানার বলে চালিয়ে দিয়েছে নিজেকে আর্মিতে।'

'তাহলে ওরা...?' প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না হতভম্ব পিয়েনার।

'জার্মান ছিল।'

'জার্মান!'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন। ইমিগ্রান্টস্।'

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল রানা, 'বহিরাগতদের রেকর্ডস কারা সংরক্ষণ করে আপনার দেশে?'

'প্রিটোরিয়ার ইউনিয়ন বিল্ডিং।'

হাতঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'জেনারেল গেরহার্ডকে একটা টেলিফোন করতে চাই।'

'শিওর। পুলিস স্টেশনে চলুন।'

ওটাও ফ্লীট স্ট্রীটেই। দোতলা, হলুদ ইঁটে তৈরি। রানার অনুরোধের উত্তরে বললেন জেনারেল, 'নিশ্চয়ই। অপেক্ষা করুন। চেক করছি আমি।'

ভাগ্যই বলতে হবে, ইউনিয়ন বিল্ডিঙের প্রায় সব কিছুই কম্পিউটর নিয়ন্ত্রিত। দু'মিনিটে ফাইল নম্বর বের করে ফেলল ওরা জেনারেল গেরহার্ডের নির্দেশে। ফাইলটা বের করে টেলেক্স মেশিনের সামনে বসল রেকর্ড কীপার স্বয়ং।

ইস্ট লণ্ডন পুলিস স্টেশনে কফি পান করার ফাঁকে মেসেজটার ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। তারপর নির্বিকার মুখে তুলে দিল ওটা অ্যানড্রিয়াসের হাতে।

দীর্ঘ মেসেজটা পড়া শেষ করে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল সে, 'গুড গড! কে

ভেবেছিল?'

'এখানে ইহুদিদের কোন উপাসনালয় আছে?' এক পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে, পার্ক অ্যাভিনিউতে। মাত্র দু'মিনিটের পথ।'

ধপধপে সাদা রঙ করা, ওপরে কালো গম্বুজ। গম্বুজের শীর্ষে স্টীলের দণ্ড, ডেভিডের নক্ষত্র ধরে রেখেছে ওটা। প্রায় ফাঁকা সিনাগগ। একজন কেয়ারটেকার আছে কেবল। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে বয়স। মাথায় উলের কালো বনেট। মাসুদ রানার প্রশ্নের উত্তরে সিনাগগের বর্তমান র‍্যাবির ঠিকানা বলল লোকটা। বলল, 'তাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।'

কেয়ারটেকার সমবয়সীই হবে র‍্যাবি। তবে বেশ স্বাস্থ্যবান। গাল ভরা কাঁচাপাকা দাড়ি। আয়রন গ্রে চুল। এক নজর দেখেই বুঝে নিল মাসুদ রানা, একে খুঁজছে না ও। খুঁজছে আরও অনেক বয়স্ক একজনকে।

'আপনার আগে কে র‍্যাবি ছিলেন এখানে, বলতে পারেন?' প্রশ্ন করল ও।

'আমার চাচা। র‍্যাবি শ্যাপিরো।'

'বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় পেতে পারি তাঁকে?'

'ভেতরে আসুন।'

অন্দর মহলের দিকে রানাকে নিয়ে চলল র‍্যাবি। লম্বা করিডরের একেবারে শেষ মাথায় বন্ধ একটা দরজা। দু'বার মৃদু নক করে দরজা খুলল সে।

'আঙ্কেল শ্যাপিরো, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে।'

ঘর অন্ধকার বলে এতক্ষণ কিছু দেখতে পায়নি মাসুদ রানা। চোখ সয়ে

ঞাসতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই ভেতরে চোখ বোলাল ও। আসবাবপত্র প্রায় কিছুই নেই ঘরে। চল্টা ওঠা কার্পেটের ওপর জড় পদার্থের মত বসে আছে থু রে এক বুড়ো। ছানি পড়া চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘন ঘন ওপর-নিচ করছে মুখটা। বোঝা গেল দেখতে পায় না।

ভেতরে ঢুকল রানা। ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে আনেনি এবার। গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছে। দীর্ঘ সময় পর বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল ও।

'এয়ারপোর্ট।'

দশ

একটা কিছু চলছে ভেতরে ভেতরে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাতে জেনারেল বরিসভের। কোন গোপন অপারেশন চালানো হবে হয়ত ব্রিটেনে। মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভের বিশেষত্ব জানা আছে তাঁর। প্রয়োজন পড়লে একজন ইংলিশম্যান, মার্টিন ফ্ল্যানারি হিসেবে সে দেশে পুশ ইন করানোর জন্যে বছরের পর বছর ধরে ঘষেমেজে তৈরি করা হয়েছে তাকে। চেরনোভস্কির কাছ থেকে নিয়ে যাওয়াও হয়েছে। ওরই জন্যে প্রস্তুত সেই লিজেণ্ড।

পপলার ট্রান্সমিটার, ভাবছেন এফসিডি চীফ, উত্তর মিডল্যাণ্ডের কোন এক জায়গায় স্থাপন করেছিলেন তিনি ওটা নিজ হাতে। মেজর ক্রিপচেঙ্কোকে যদি 'প্যাকেজ' চোরাচালানের জন্যে বদলি করা হয়ে থাকে, তাহলে আরও কয়েকজনকেও করা হয়েছে নিঃসন্দেহে। বিভিন্ন ডিরেক্টরেট

থেকে। সে যাই হোক, সব এক সুতোয় বাঁধা। ব্রিটেনেই পাঠানো হচ্ছে মেজর তাতায়েভকে, অথবা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এরই মধ্যে।

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তাঁকে পর্যন্ত জানানো হলো না ব্যাপারটা, এ কেমন কথা? তাঁর কষ্টে লাগানো গাছের ফল খেয়ে আসবে গিয়ে আরেকজন, তাও তাঁকে না জানিয়ে? চেরনোভস্কির ধারণাই ঠিক, জেনারেল সেক্রেটারি নিজেই কোন উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন। কেজিবিকে বাদ দিয়ে।

বিপদের গন্ধ পেলেন ভাদিম ভ্লাদিমিরোভিচ বরিসভ। জি. এস. কোন অভিজ্ঞ ইন্টেলিজেন্স অফিসার নন। তার ওপর অসুস্থ, হার্টের রোগী। মাথারও হয়তো ঠিক নেই। কে জানে কোন্ মহাকেলেঙ্কারিতে ফাঁসিয়ে দেবেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে। যতই জোর গলা করে চেঁচানো হোক না কেন, এদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোর ওপর বিশ্ববাসীর আস্থা একেবারেই নেই বলা চলে। কিছু যদি সত্যিই বেতাল হয়ে যায়, বারোটা বেজে যাবে।

আজ সকালে অফিসে এসেই লোক লাগিয়ে দিয়েছেন জেনারেল গোপনে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে। প্রথমে জিআরইউ প্রধানের সন্ধান বের করবে তারা। সত্যিই তিনি অসুস্থ, না আর কিছু? সেই সঙ্গে আরও কেউ কাজে অনুপস্থিত আছেন কিনা। থাকলে কে কে, কতদিন থেকে, জানতে চান তিনি। খবর আসতে পারে, তাই লাঞ্চ করতে বেরোননি বরিসভ রোজকার মত, সেরে নিয়েছেন অফিসেই।

ঘড়ি দেখলেন তিনি। দুটোর বেশি বাজে, এখনও কারও পাত্তা নেই। গেল কোথায় ব্যাটারা? ভাবতে ভাবতেই ইন্টারকম বেজে উঠল। 'কমরেড জেনারেল! কমরেড "এ" দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'পাঠিয়ে দাও,' হুঙ্কার ছাড়লেন বরিসভ।

ভেতরে ঢুকল রোগা-পাতলা এক যুবক। পিঠটা সামান্য সামনের দিকে বাঁকা। লোকটার পেট আছে কিনা, শার্টের ওপর থেকে ঠাহর করা যায় না।

দেখে মনে হয় ছয় মাস দানাপানি জোটেনি, পেট একেবারে পিঠে ঠেকেছে গিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত হালকা নীল চোখ। সোনালি চুল। চেহারা সব মিলিয়ে হাফ প্রতিভাবানের মত। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, নিচু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে রিপোর্ট করল 'এ', বা আঁদ্রেই। ভেতরের খোঁজ খবর জানার জন্যে সকালে বরিসভ যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের দলনেতা।

ওয়েল ওয়েল ওয়েল, ভাবলেন তিনি। হাড় হাভাতে, হাড়গিলে, ঘাটের মড়া ভিক্টরোভিচও? নামগুলো শোনামাত্র মাথার ভেতরের প্রাকৃতিক কম্পিউটরে 'ফিড' করে ফেলেছেন জেনারেল। ভুল হওয়ার চান্স নেই। 'ঠিক আছে, আঁদ্রেই। ওয়েল ডান। যেতে পারো এবার তুমি। দরকার হলে পরে খবর দেব।'

'ইয়েস, কমরেড জেনারেল।'

যুবক বেরিয়ে যেতে ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি আবার। মনের সুখে ধুমসে গালাগাল করছেন ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভকে। তুমি শালা কেজিবির পুরানো অভিজ্ঞ অফিসার। আর যে থাকে থাকুক, তুমি কেন এর মধ্যে? কিছু যদি উল্টোপাল্টা হয়ে যায়? কোথায় পালাবে তখন? রাখো, প্রতিজ্ঞা করলেন জেনারেল, বার করছি তোমাদের অপারেশন।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। তিন কু-পরামর্শদাতার একজন, ড. পাভলভকে ইচ্ছে করলেই ব্ল্যাকমেইল করতে পারেন বরিসভ। সে রসদ আছে তাঁর হাতে। ওগুলো ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখালে বাপ-বাপ করে পেটের সব কথা উগড়ে দেবে সে, কোন সন্দেহ নেই। তবে তার আগে আরেকটা ব্যাপার জানতে হবে। কষ্ট করে বরিসভ নিজেই জেনে নেবেন, সাহায্য নেবেন না কারও। তাতে বিপদ হতে পারে।

সন্ধের পর মস্কোর বারো মাইল পশ্চিমের এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে হাজির হলেন তিনি। অবসর নেয়ার পর থেকে এই বিল্ডিঙেই আছেন ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভ। ছ' তলায় লিফট থেকে বেরোলে সামনেই দরজা।

প্রতি ফ্লোরে একটাই ফ্ল্যাট এখানে। দরজা খুললেন মিসেস গ্রেগরিয়েভ। স্বামীর ঠিক উল্টো মহিলা। ভীষণ মোটা।

'হ্যালো!' হাসলেন বরিসভ।

কিন্তু মহিলা গম্ভীর। 'কমরেড জেনারেল?'

'কমরেড ভিক্টরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি নেই?'

'না।'

'ও-হো! কোথায় গেছেন?'

'শহরের বাইরে।'

শহরের বাইরে! ভাবলেন বরিসভ। 'আপনাকে রেখে? আয় হায়! ওনার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা, গাড়ি চালালে ক্ষতি হবে না? বিশেষ করে একবার যখন স্ট্রোক…।'

'সঙ্গে ড্রাইভার আছে,' একেঘেয়ে সুরে বলল মহিলা।

'যাক, তাও ভাল। আমি তাহলে চলি।'

'কেন এসেছিলেন, বললেন না?'

'এমনিই। এদিক দিয়েই ফিরছিলাম। ভাবলাম, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, একটু খোঁজ নিয়ে যাই। এই আর কি!'

'ও, আচ্ছা।'

শহরে ফিরে এলেন জেনারেল বরিসভ। চিন্তিত। বাসায় ফিরে কেজিবি মোটর পুলে ফোন করলেন তিনি। নিজের পরিচয় জানিয়ে অ্যাটেনডেন্টকে নির্দেশ দিলেন চীফ ক্লার্ককে ডেকে আনতে, কথা বলবেন তার সঙ্গে। কয়েক সেকেণ্ড পরই লোকটার উৎকণ্ঠিত গলা শুনতে পেলেন বরিসভ। দৌড়ে আসতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে।

'ইয়েস, কমরেড জেনারেল?'

'তুমি একটা দারুণ কাজ করেছ আমার বন্ধুর জন্যে পুলের সেরা ড্রাইভারটিকে পাঠিয়ে, বুঝলে? রিটায়ার্ড জেনারেল ভিক্টরোভিচ

গ্রেগরিয়েভের কথা বলছি। খুব প্রশংসা করলেন তিনি তোমার দেয়া ড্রাইভারের···ইয়ে, কি যেন নাম···?'

'গ্রেগরিয়েভ, কমরেড জেনারেল। ওর নামও গ্রেগরিয়েভ।'

বা বা বা, সোনায় সোহাগা! 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেগরিয়েভ। যাক, শোনো। ক'দিন পর ছুটিতে যাচ্ছে আমার ড্রাইভার। তখন আমার ওকেই চাই।'

'নিশ্চই, কমরেড জেনারেল, নিশ্চই।'

তিন দিন পর লোকটা নিজেই টেলিফোন করল জেনারেলকে। 'কমরেড জেনারেল, সেদিন বলেছিলেন আপনার ড্রাইভার ছুটিতে যাবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'গ্রেগরিয়েভ ফিরে এসেছে, কমরেড জেনারেল। যদি বলেন···'

'কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো ওকে। ঠিক আছে?'

'জ্বি।'

'ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, তোমার প্রমোশনের জন্যে সুপারিশ করব আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল। অনেক ধন্যবাদ।'

নিজের নিয়মিত ড্রাইভারকে ডেকে দু'দিনের জন্যে ছুটি দিয়ে দিলেন জেনারেল। বউ-বাচ্চা নিয়ে বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসার পরামর্শও দিলেন তাকে। কেন যেন খুব রাগ হচ্ছে তাঁর। আমার সঙ্গে বিটলামি? ভাবছেন তিনি, দাঁড়াও। দেখাচ্ছি মজা!

পরদিন অফিস থেকে ফেরার পথে গ্রেগরিয়েভকে কথার জালে একটু একটু করে জড়িয়ে ফেললেন বরিসভ। সে ব্যাটাও তেমনি। একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল তার ব্যাপারে পুলে খোঁজ-খবর নিয়েছেন ফোনে, যা তা কথা! তার ওপর অন্য অসংখ্য ড্রাইভার থাকতেও বেছে নিয়েছেন তাকেই। কাজেই গ্রেগরিয়েভও জেনারেলকে সন্তুষ্ট করতে উদগ্রীব।

'কেমন লাগছে আমার গাড়ি চালাতে, গ্রেগরিয়েভ?'

'খুব ভাল লাগছে, কমরেড জেনারেল।' এত বড় এক অফিসার সাধারণ ড্রাইভারের অনুভূতি জানতে চাইছেন, ব্যাপারটা কল্পনারও বাইরে। গলে গেল লোকটা। 'খুব ভাল লাগছে।

'তোমার খুব প্রশংসা শুনেছি রিটায়ার্ড জেনারেল ভিক্টরের কাছে। ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভের কাছে। আমার খুব বন্ধু মানুষ।'

মুখের কৃতার্থ মার্কা হাসি জমাট বেঁধে গেল ড্রাইভারের, ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন বরিসভ ভিউ মিররের সাহায্যে। তার মানে এ বিষয়ে মুখ খুলতে বারণ আছে তার। 'জানতাম ও নিজেই ড্রাইভ করে,' যেন কথার কথা, গুরুত্বহীন, শুনলে শুনতে পারো, না শুনলে নেই, এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

'জ্বি, আমিও তাই শুনেছি, কমরেড।'

'তারপর? কোথায় কোথায় গিয়েছ ওকে নিয়ে?'

দীর্ঘ নীরবতা। লোকটা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন জেনারেল। 'মস্কোর আশেপাশেই, কমরেড।'

'নির্দিষ্ট কোন জায়গা, গ্রেগ?'

'জ্বি না।'

'ড্রাইভার, গাড়ি থামাও,' এইবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন তিনি।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। তাড়াতাড়ি চইকা লেন ছেড়ে ঢুকে পড়ল দক্ষিণমুখি ট্রাফিকের মিছিলে। কিছুদূর এগিয়ে বাঁ হাতি একটা বাই লেন দেখে সেঁধিয়ে দিল লিমুজিন, দাঁড় করিয়ে ফেলল।

সামনে ঝুঁকে বসলেন বরিসভ। তেমনি কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি জানো আমি কে?'

কুঁকড়ে গেল গ্রেগরিয়েভ। 'জানি, কমরেড জেনারেল।'

'কেজিবিতে কোন পদে আছি জানো?'

দ্রুত মাথা দোলাল লোকটা। 'জানি।'

'এদিকে তাকাও! ঘোরো!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল সে। পরক্ষণেই কলজের পানি বরফ হয়ে গেল জেনারেলের রক্তচক্ষু দেখে। 'সোজা সত্যি কথা বলো, কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে ভিক্টরকে।'

দীর্ঘ সময় নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল ড্রাইভার লোকটা। অভিজ্ঞ লোক, পরিস্থিতি বুঝে নিল। মুখ খোলার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ ছিল মেজর কিরলভের। কিন্তু সে মেজর। আর ইনি···একজন জেনারেল জেনারেলই। 'প্রতিদিন একই জায়গায় নিয়ে গিয়েছি তাঁকে, কমরেড জেনারেল।'

'কোথায়?'

'উসভোয়। কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির দাচায়।'

হুঁম! হিসেবে তাহলে ঠিকই আছে আমার। 'কেন?'

'জানি না। রোজ ভোর অন্ধকার থাকতে নিয়ে গেছি। আবার মস্কো ফিরিয়ে এনেছি গভীর রাতে।'

'কতদিন চলেছে এই আসা-যাওয়া?'

'আঠারো দিন, কমরেড জেনারেল।'

'আর কাকে কাকে দেখেছ সেখানে, বিগ শট!'

'চারজন ছিলেন। তবে একজনকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না। '৮৫ সালে আফগানিস্তানের কান্দাহারে ছিলাম আমি, কমরেড। সে সময় গ্রু মোটর পুলে চাকরি করতাম, ওদের একজন কর্নেলের গাড়ি চালাতাম।'

'জেনারেল মার্চেঙ্কো?'

'রাইট, কমরেড জেনারেল।' ভুরু কুঁচকে গেল গ্রেগরিয়েভের। বরিসভ জানলেন কি করে সে কথা বুঝে উঠতে পারছে না।

'বেশ। এবার বলো, তোমাকে মুখ খুলতে নিষেধ করে দিয়েছিল কে, মেজর কিরলভ?'

ভেতরে ভেতরে আস্ত একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেও তার মুখ দেখে

কিছুই বোঝা গেল না। 'জ্বি।'

'ওকে, গ্রেগ। চলো, ফিরে চলো। ঘাবড়িয়ো না, এসব কথা গোপনই থাকবে।'

চমৎকার সুট পরা দীর্ঘদেহী যুবককে মৃদু হাসি উপহার দিল যুবতী রিসেপশনিস্ট। 'কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে, স্যার?'

'আমি এখানে নতুন এসেছি। একটা বাড়ি ভাড়া নিতে চাই।'

'এক মিনিট। আপনাকে মিস্টার স্মিথের সঙ্গে কথা বলতে হবে। হাউজিঙের ব্যাপারটা উনিই দেখেন,' ফোনের রিসিভার তুলল মেয়েটি। 'কি বলব তাঁকে, স্যার?'

মিষ্টি করে হাসল যুবক। 'ফ্ল্যানারি। মার্টিন ফ্ল্যানারি।' অফিসটা পুরানো ধাঁচের। ভাবল তাতায়েভ। ইন্টারকম নেই।

দু'মিনিট পর স্মিথের কক্ষে ডাক পড়ল তার। 'আমি এ অঞ্চলে নতুন। ব্যবসার খোঁজে ডরসেট থেকে এসেছি। ফ্যামিলি আনতে পারিনি বাসার কারণে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ভাল বাসা চাই, মিস্টার স্মিথ।'

'আপনি কি বাড়ি কেনার কথা মীন করছেন, স্যার?'

'না, এখনই নয়। পরে ভালমত দেখেশুনে কিনব। এখন চাই ভাড়া বাড়ি। দুই-এক মাসের জন্যে। মানে হেড অফিস যতদিন থাকতে বলে আর কি! এর পরও যদি থাকতে হয়, তাহলে ঠিক করেছি কিনেই ফেলব একটা।'

'বুঝেছি, শর্ট লীজ।'

'ঠিক তাই,' বলল ভ্যালেরি তাতায়েভ।

'আনফার্নিশড় নাকি ফার্নিশড়, স্যার?'

'ফার্নিশড়, যদি সম্ভব হয়।'

'নিশ্চই হবে, স্যার।' কতগুলো বাছাই করা ফোল্ডার বের করল

লোকটা ড্রয়ার থেকে। 'এগুলো দেখুন। চারটে আছে। অল আর ফার্নিশড্।'

সব শেষেরটি পছন্দ হলো মেজর তাতায়েভের। একেবারে যেমনটি সে চাইছিল মনে মনে। দোতলা বাড়ি। ছোট, ছিমছাম বাংলো। 'এটাই চাই আমার।'

'অল রাইট। বাড়ির মালিক এঞ্জিনিয়ার, সৌদি আরবে চাকরি করেন। ছ' মাস পর দেশে ফিরে আসার কথা। প্রয়োজনে ওই পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন আপনি।'

'চমৎকার। বাসাটা দেখতে চাই একবার।'

'একশোবার, স্যার।'

এলাকাটা 'দ্য হে'জ' নামে পরিচিত। ভ্যালেরির পছন্দের বাড়ির নাম্বার টুয়েলভ, চেরিহে'জ ক্লোজ। অন্য বাড়িগুলোর কোনটা ব্যাকেনহে'জ, কোনটা গরসহে'জ, অ্যালমণ্ডহে'জ, হিদারহে'জ ইত্যাদি ইত্যাদি। বারো ফুট পাকা রাস্তা থেকে ছয় ফুট তফাতে চেরিহে'জ। কোনদিকেই সীমানা দেয়াল নেই। এক পাশে ছোট একটা গ্যারাজও আছে বাড়িটার। যেটা পরে বিশেষ কাজে লাগবে ভ্যালেরির। পিছনে ছোট্ট ফুলের বাগান। এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল নেট দিয়ে ঘেরা। কিচেন থেকে বাগানে যাওয়ার পথ আছে।

ওপরে তিন বেড তিন বাথ; নিচে বেশ বড় হলরুম-কাম-ডাইনিং, কিচেন ইত্যাদি। প্রতিটি আসবাব, যেখানে যেটা প্রয়োজন, মজুত আছে। ভেতরের সব দরজা কাঠের হলেও মূল দরজা পুরু কাঁচের, স্লাইডিঙ।

'খুব পছন্দ হয়েছে আমার বাড়িটা। এটাই চাই।'

অফিসে ফিরে ভাড়া গ্রহণের শর্তাদির ব্যাপারে জানাল তাকে স্মিথ। সঙ্গে দু'মাসের ভাড়া অগ্রীম। রেফারেন্স হিসেবে নিজ কোম্পানির জেনেভা হেড অফিসের ঠিকানা দিল তাতায়েভ এবং ডরসেটের বারক্লেজ ব্যাংকের ওপর একটা অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করল।

তাকে নিশ্চয়তা দিল স্মিথ, এ দুটোর ব্যাপারে যদি কোন আপত্তি না আসে, তো দু'দিন পর, সোমবার বাড়ি হস্তান্তর করা হবে। গভীর আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল মার্টিন ফ্ল্যানারি ওরফে ভ্যালেরি আলেক্সেইভিচ তাতায়েভ। ভাল করেই জানে কোন আপত্তি আসবে না। সোমবার সকালে কোলচেস্টারের এক কার রেন্টাল এজেন্সি থেকে চমৎকার লেটেস্ট মডেলের একটা ফ্যামিলি সেলুন ভাড়া নিল সে। ওদের জানাল তাতায়েভ যে ডরচেস্টার থেকে এসেছে সে অফিসের কাজে। এসেক্স এবং সাফোকে হাউস-হান্টিঙে আছে।

নিজের গাড়ি স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের ব্যবহারের জন্যে ডরসেটে রেখে এসেছে। ক'দিন এখানে থাকতে হবে ঠিক নেই, তাই এখনই গাড়ি কেনার ব্যাপারে চিন্তা করছে না। তবে কম করেও দিন পনেরো থাকবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তাতায়েভের ড্রাইভিং লাইসেন্সে কোন খুঁত নেই। ওতে তার ডরচেস্টারের ডরসেটের ঠিকানাও আছে। তার ওপর ওটা ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স। নগদে এক সপ্তাহের ভাড়া এবং ইনশিওরেন্সের টাকা পরিশোধ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভ্যালেরি।

এবার একজন ইনশিওরেন্সের দালাল খুঁজে বের করল সে। তার কাছে ব্যাখ্যা করল নিজের সমস্যা। অনেক বছর বিদেশে চাকরি করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছে মার্টিন ফ্ল্যানারি। বিদেশে যাওয়ার আগে নিজের গাড়িই চালাত। বিদেশে চাকরির মেয়াদ শেষ, এখানেই আবার স্থায়ী হতে চায় সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটা ভেহিকেল কিনবে। সেজন্যে ইনশিওরেন্স কভার প্রয়োজন, লোকটা কি পারবে সে ব্যবস্থা করে দিতে?

কি ধরনের ভেহিকেল কেনার ইচ্ছে মিস্টার ফ্ল্যানারির? মোটর সাইকেল? হ্যাঁ, ভাল সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তিনি। রাস্তাঘাটে গাড়ির যা ভিড়, ছোটখাট জিনিসই ভাল। ফাৎরা পোলাপান হলে হয়তো ঝামেলা হত, কিন্তু মিস্টার ফ্ল্যানারি একজন দায়িত্বশীল পূর্ণবয়স্ক, কাজেই, তাছাড়া

যখন ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, ও হয়ে যাবে। অসুবিধে হবে না করাতে।

ঠিকানা? ও, হাউস-হান্টিং? খুব স্বাভাবিক। ইপসউইচের গ্রেট হোয়াইট হল হোটেল? সে তো আরও ভাল হলো। নিশ্চিন্তমনে মোটর সাইকেল কিনে ফেলতে পারেন মিস্টার ফ্ল্যানারি। পরে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কেবল তাকে জানালেই চলবে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনতে চান? সে জন্যে অবশ্য থার্ড পার্টি ইনশিওরেন্স কভার প্রয়োজন হবে। ঠিক আছে, সব কাজ সেরে রাখবে সে। আর···হোটেল ছেড়ে যদি এরমধ্যে ভাড়া বাসায় উঠে যান তিনি তো সে ঠিকানাটাও দরকার হবে।

সন্ধে নাগাদ ইপসউইচ ফিরে এল তাতায়েভ। মোটামুটি একটা ব্যস্ত দিন গেল আজ। কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না করেই প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলা গেছে। কোন ট্রেইলও রেখে আসেনি সে। হোটেল এবং কার রেন্টাল এজেন্সিতে নিজের ডরসেটের যে ঠিকানা দিয়েছে তাতায়েভ, তার কোন অস্তিত্বই নেই। এস্টেট এজেন্ট আর ইনশিওরেন্স ব্রোকার জানে তার হোটেলের অস্থায়ী ঠিকানা। বারক্লেস ব্যাঙ্কও তার হোটেলের ঠিকানাই জানে। জানে মিস্টার মার্টিন ফ্ল্যানারি 'হাউস হান্টিং' অ্যাট দ্য মোমেন্ট।

ব্রোকার লোকটা তার কাজ করে দিলেই হোটেল ছেড়ে দেবে তাতায়েভ। একমাত্র এস্টেট এজেন্ট ছাড়া কেউ জানবে না কোথায় আছে সে। এ সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

পরদিন অ্যাসেক্স-এর স্টো মার্কেটে পেয়ে গেল তাতায়েভ মনে মনে যা খুঁজছিল। একটা বিএমডব্লিউ শ্যাফট ড্রাইভ কে-হাণ্ড্রেড মোটর সাইকেল। নতুন নয়, তবে কণ্ডিশন চমৎকার। বড়, শক্তিশালী এঞ্জিন। তিন বছর ব্যবহার করেছে আগের মালিক, চলেছে মাত্র বাইশ হাজার মাইল। দামের বিশ পার্সেন্ট নগদ দিয়ে কিনে ফেলল ওটা তাতায়েভ। তবে এখনই নিয়ে

যেতে পারছে না। বাকি দাম শোধ করে নিতে হবে।

ওই দোকান থেকেই প্রয়োজীয় আউটফিট কিনল সে। কালো লেদার ট্রাউজারস এবং জ্যাকেট। গন্টলেটস, জিপ-সাইডেড জ্যাকবুট। এবং গাঢ় রঙের স্লাইড-ডাউন ভাইজরওয়ালা একটা ক্র্যাশ হেলমেট। এরপর দোকানিকে অনুরোধ করল বাইকটার রিয়ার হুইলের সঙ্গে বড় একটা প্যানিয়ার সেট করে দিতে, তালাচাবি ওয়ালা একটা ফাইবার গ্লাস বক্সসহ। দু'দিনের মধ্যে গাড়িটা তাতায়েভের ফরমায়েশ অনুযায়ী ডেলিভারি দেয়ার নিশ্চয়তা দিল দোকানি।

এবার একটা ফোন বুদ থেকে ইনশিওরেন্স ব্রোকারকে ফোনে বাইকটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার জানিয়ে দিল ও। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মিস্টার ফ্ল্যানারির জন্যে ত্রিশ দিনের একটা টেম্পোরারি ইনশিওরেন্স পলিসির ব্যবস্থা করে দেবে বলে আশ্বাস দিল লোকটা। ইপসউইচের হোটেলের ঠিকানায় মেইল করে দেবে সে ওটা কালই।

স্টোমার্কেট থেকে বেরিয়ে উত্তরের থেটফোর্ডের দিকে চলল ভ্যালেরি তাতায়েভ। নরফোক কাউন্টি বর্ডারের সামান্য এপাশে খুদে থেটফোর্ড। মাঝ দুপুরের খানিক পর পেয়ে গেল সে প্রার্থিত জিনিসটি। ম্যাকডালেন স্ট্রীটের স্যালভেশন আর্মি হলের কাছাকাছি এক সারিতে পাশাপাশি একত্রিশটা লক্ আপ গ্যারাজ। দুটোর বন্ধ দরজায় ঝুলছে 'টু লেট' নোটিস।

ওগুলোর মালিককে খুঁজে বের করল তাতায়েভ। গ্যারাজের কাছেই বাসা। এক মাসের ভাড়া দিয়ে ওর একটা ভাড়া নিল সে। ভেতরটা ছোট, তবে তাতায়েভের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। টাকার রশিদ চাইল না তাতায়েভ। ট্যাক্স-ফ্রি ক্যাশ পেয়ে খুশি হলো মালিক। তাকে নিজের কল্পিত নাম-ঠিকানা দিল সে। দরজার চাবি দিয়ে বিদেয় হলো লোকটা।

ভেতরে রাইডারস অ্যাকসেসরিজ রেখে তালা মেরে বেরিয়ে এল তাতায়েভ। আর মাত্র একটা কাজ বাকি। স্থানীয় মার্কেট থেকে দুটো দশ

গ্যালনি প্লাস্টিক ড্রাম কিনল সে, দুই দোকান থেকে। এরপর দুটো পাম্প থেকে পেট্রল কিনে ভরল ওদুটো। অ্যাকসেসরিজের সঙ্গে ড্রাম দুটো গ্যারাজজাত করল তাতায়েভ। তারপর সেলুন হাঁকিয়ে ফিরে চলল ইপসউইচ। সুইটে যাওয়ার আগে ক্লার্ককে জানাল সে যে কাল সকালে চেক আউট করবে সে। বিলটা যেন তৈরি করে রাখা হয়।

রাতে গভীর ঘুম হলো তার। এক ঘুমে সকাল। তৈরি হয়ে নিচে নেমে এল তাতায়েভ। তার লাগেজ বেড়ে গেছে। আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছে পেল্লায় এক সুটকেস। ভেতরে শুধু কাপড়-চোপড়, স্থানীয় মার্কেট থেকে কেনা। রিসেপশনিস্ট ক্লার্ককে জানাল ভ্যালেরি, নরফোক চলেছে সে। তার নামে কোন চিঠিপত্র এলে যেন পেণ্ডিঙ কালেকশনে রেখে দেয়া হয়।

রিসেপশন থেকেই ব্রোকার লোকটাকে ফোন করল সে। জানা গেল, তার পলিসি ঘন্টাখানেক আগেই ইস্যু করিয়ে ছেড়েছে লোকটা। ধন্যবাদ জানাল তাকে তাতায়েভ, বলল, ওটা যেন সে ডাকে না পাঠায়। নিজেই তার কাছ থেকে সংগ্রহ করবে ওটা ফ্ল্যানারি। হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই তাই করল তাতায়েভ। তারপর উঠে এল টুয়েলভ চেরিহে'জ-এ।

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসা ওয়ান-টাইম প্যাডে খুবই সংক্ষিপ্ত একটা কোডেড মেসেজ প্রস্তুত করল সে খুব সতর্কতার সঙ্গে। যত সফিস্টিকেটেড কোড ব্রেকিং কম্পিউটরই হোক না কেন, ওয়ান-টাইম প্যাডের কোড ব্রেক করার ক্ষমতা তার নেই। জানা আছে ভ্যালেরি তাতায়েভের। কোড ব্রেকিং কৌশল নির্ভর করে মূলত মেসেজের প্যাটার্ন আর রিপিটেশনের ওপর।

কিন্তু ওয়ান-টাইম প্যাড ব্যবহারে সে ভয় একেবারেই নেই। ওর একেক পাতায় লেখা হয় একটা করে শব্দ। কোন প্যাটার্ন থাকে না, রিপিটেশনের তো প্রশ্নই আসে না। পরদিন আবার থেটফোর্ড এল

তাতায়েভ। সেলুনটা গ্যারাজে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল স্টোমার্কেট। আসার সময় তার ক্যানভাস গ্রিপে করে সেদিনের কেনা লেদার জ্যাকেট-ট্রাউজার, বুট আর হেলমেটটা নিয়ে এসেছে।

বিএমডব্লিউর বাকি টাকা শোধ করল তাতায়েভ একটা সার্টিফাইড চেকের মাধ্যমে। তারপর গ্রিপটা প্যানিয়ারের ফাইবারগ্লাস বক্সে ভরে বেরিয়ে এল বাইক নিয়ে। হাইওয়ে ধরে দক্ষিণে এগোল তাতায়েভ। মাইল দশেক এগোবার পর পছন্দমত একটা জায়গা পেয়ে বিরতি দিল। জায়গাটা প্রায় নির্জন, দু'পাশে ঘন বন। সামনে পিছনে যতদূর চোখ যায় ভাল করে দেখে নিল সে। গাড়ি ঘোড়া নেই। চট্ করে মোটর সাইকেল নিয়ে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল সে।

দ্রুত হাতে পরনের সাধারণ ট্রাউজার-জ্যাকেট বদলে পরে নিল লেদারেরগুলো। জুতোও বদল করল সে। আগেরগুলো প্রথমে গ্রিপ, পরে প্যানিয়ারে আশ্রয় পেল। হেলমেট আগে থেকেই পরা ছিল। বেরিয়ে আসাটা আগেরবারের মত সহজ হলো না। রাস্তা ফাঁকা হওয়ার জন্যে প্রায় বিশ মিনিট ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হলো তাতায়েভকে। তারপর ভোঁ করে বেরিয়ে এল সে পথে। যথাসম্ভব দ্রুত ছুটল যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে। গন্তব্য অনেক দূরে।

রাত এগারোটায় থেটফোর্ড ফিরে এল ভ্যালেরি তাতায়েভ। গ্যারাজে মিনিট পাঁচেক অবস্থান করল সে। কাপড় পাল্টাল। মোটর সাইকেল ভেতরে রেখে বের করল কারটা। তারপর গ্যারাজে তালা মেরে ইপসউইচের চেরিহে'জ ক্লোজের উদ্দেশে রওনা হলো। প্রায় সারাদিন গাড়ি চালিয়েও এতটুকু ক্লান্ত হয়নি সে।

আপনমনে শিস বাজাতে বাজাতে ড্রাইভ করছে তাতায়েভ।

এগারো

কমসোমলস্কি প্রসপেক্টের এক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের টপ্ ফ্লোরে থাকেন ড. জোসেফ পাভলভ। এর জানালা দিয়ে মস্কো ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ দিক এবং মস্কভা নদীর অনেকটা দেখা যায়। সন্ধে ছ'টায় ডোরবেলের আওয়াজ উঠল। তিনি নিজেই এসে দরজা খুললেন। আগন্তুকের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকলেন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। চিনতে পারলেন না। লোকটির হাতে একটা পোর্ট ফোলিও।

'কমরেড প্রফেসর পাভলভ?'

'হ্যাঁ!'

'আমি জেনারেল বরিসভ। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ। জরুরি একটা বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।'

জেনারেলের বাড়িয়ে ধরা পরিচয়পত্রটা ভাল করে লক্ষ করলেন প্রফেসর। মাত্র এক নজরই যথেষ্ট। ওটা ফিরিয়ে দিয়ে জেনারেলকে ভেতরে ঢোকার আহবান জানালেন তিনি। এনে বসালেন দামী আসবাবে সাজানো সীটিংরুমে। মানুষটি কে, জেনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত নন প্রফেসর। যেখানে দেশের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাঁর বন্ধু, সেখানে এসব জেনারেল-ফেনারেলকে দেখে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই তাঁর। সে যে জন্যেই এসে থাকুক।

'ওয়েল, জেনারেল,' বরিসভের মুখোমুখি বসলেন তিনি। 'অধমের প্রতি এই অযাচিত সম্মান দেখানোর কারণ?'

কথাগুলো পছন্দ হলো না জেনারেলের। ইচ্ছে হলো ব্যাটার ফোলা গালে কষে একটা চড় লাগিয়ে দিতে। কিন্তু লোকটা পার্টির খুব উঁচু পদে আসীন, সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য, তাই ওটা সম্ভব নয়। তোমার দাঁত কেলানো বার করছি, দাঁড়াও। 'কমরেড প্রফেসর, এখানে এসেছি আমি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের স্বার্থে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ তো।'

'আপনি এবং আরও তিনজন, গত প্রায় তিন সপ্তা উসভোয় কী কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কমরেড?'

আক্ষরিক অর্থেই প্রচণ্ড এক চড় খেলেন যেন প্রফেসর। এবং মনে মনে যেটা আশা করছিলেন বরিসভ, দাঁত কেলানোও বন্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত লাগল তাঁর নিজেকে চরম বিস্ময়ের ঘূর্ণি থেকে উদ্ধার করতে। প্রকাণ্ড মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল রাগে।

'জেনারেল বরিসভ!' ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছাড়লেন পাভলভ। 'আপনি আপনার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন।

নিরীহ কণ্ঠে বললেন জেনারেল, 'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।' প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে তাঁকে।

'কিসের কথা বলছেন? আমি বুঝতে পারছি না!'

'আমার বিশ্বাস, পারছেন। এবং এ-ও বিশ্বাস করি আপনি আমাকে জানাবেন, ওখানে কেন প্রতিদিন যেতেন আপনারা। কেন মেজর তাতায়েভ, মেজর ক্রিপচেঙ্কোকে ডিটাচ করা হয়েছে তাদের ইউনিট

থেকে।'

হাত প্রসারিত করলেন প্রফেসর। 'আপনার অথরিটি, প্লীজ।'

'আমার র‍্যাঙ্ক আর সার্ভিসই এ-জন্যে যথেষ্ট।'

'কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির স্বাক্ষর করা কোন অথরাইজড্ লেটার যদি সঙ্গে না এনে থাকেন, তো ওই অথরিটি আমি মানি না,' শীতল কণ্ঠে বললেন জোসেফ পাভলভ। উঠে ফোনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'আপনার বিষয়টা কমরেড জেনারেল সেক্রেটারিকে রিপোর্ট না করে পারছি না, জেনারেল।'

'কাজটা বোকার মত হয়ে যাবে, প্রফেসর,' তাঁর চেয়েও শীতল গলায় বললেন জেনারেল বরিসভ।

ডায়ালের ওপর হাত থেমে গেল প্রফেসরের। হিসেব উল্টে গেছে তাঁর, মনে করেছিলেন ফোন করার হুমকি দেখালেই চুপসে যাবে লোকটা। হয়তো কাকুতি-মিনতি শুরু করে দেবে ও-কাজ না করতে, পালাবার পথ খুঁজবে। কিন্তু গ্যাঁট হয়ে বসে তো আছেই, আবার ভয় দেখাবারও চেষ্টা করছে।

প্রফেসরের মনে দ্বিধা ঢুকিয়ে দেয়া গেছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন বরিসভ। 'মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন, কমরেড প্রফেসর। আমার কথাগুলো আগে শুনুন। ফোন তো পালিয়ে যাচ্ছে না। পরেও করতে পারবেন।'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় দুললেন কিছুক্ষণ ড. পাভলভ। কি এমন কথা থাকতে পারে লোকটার তাঁর সঙ্গে? কি করে এত নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে সে? ইতস্তত পায়ে ফিরে এলেন প্রফেসর। বসলেন। 'ঠিক আছে, বলুন, কি বলতে চান। তবে শুনে রাখুন, যে বিষয় আপনি জানতে চাইছেন, তা নিয়ে আপনি কেন, কারও সঙ্গেই কথা বলব না আমি।'

'এত তাড়াতাড়িই প্রতিজ্ঞা করে বসবেন না। আমি জানি, আমার

পুরো বক্তব্য শুনলে আপনি সেধেই সব জানাতে চাইবেন। বাদ দিন। কমরেড প্রফেসর, আপনার তো একটিই ছেলে, তাই না? গ্রোমিকো?'

হঠাৎ করেই যেন আগ্রহী হয়ে উঠলেন জোসেফ পাভলভ। 'হ্যাঁ। কেন?'

'মাস দুয়েক আগে কানাডা ঘুরে এসেছে গ্রোমিকো আমাদের এক ট্রেড ডেলিগেশনের ইন্টারপ্রিটার হিসেবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তাতে কি?'

'ওখানে এক সুন্দরী কানাডিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয় আপনার ছেলের। কয়েকদিনের মধ্যেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওরা দু'জন। এ সময়...'

'এতবড় আস্পর্ধা আপনার!' প্রায় ফেটে পড়লেন প্রফেসর রাগে। 'আমার ছেলে কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে, তার ভয় দেখিয়ে অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের একজন সদস্যকে ব্লাকমেইল করতে এসেছেন আপনি! অল রাইট, কালই পার্টিকে জানাব আমি সব কথা। দেখে নেব আপনাকে! কেজিবির যত বড় অফিসারই হন, আমি ছাড়ব না আপনাকে।'

'ঠিক আছে। সে কালকের কথা কাল দেখা যাবে। আগে আমাকে বক্তব্য শেষ করতে দিন। আমার কাছে প্রমাণ আছে মেয়েটি সিআইয়ের এজেন্ট।'

'হোয়াট!' তুলে আছাড় মেরেছে যেন কেউ প্রফেসরকে। চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেছে পলকে। 'কি বললেন?'

'ভুল শোনেননি আপনি, কমরেড প্রফেসর।'

'তা-তারপর?'

'মেয়েটি শিকারী ঘুঘু। ফাঁদে ফেলেছে গ্রোমিকোকে।'

'তার মানে...।'

'ঠিক ধরেছেন। নিভৃত হোটেল কক্ষে তাকে অজান্তেই এমন সব তথ্য

দিয়ে ফেলেছে আপনার ছেলে, যা কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি।'

ডাঙায় তোলা বোয়ালের মত কয়েকবার খুলল আর বন্ধ হলো প্রফেসরের প্রশস্ত চোয়াল। 'আমি···।' গলা ভেঙে গেল বলতে গিয়ে। 'আমি···আমি বিশ্বাস করি না! কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে যে সত্যিই গ্রোমিকো এ-কাজ করেছে?'

'কি প্রমাণ চান আপনি, কমরেড প্রফেসর? রেকর্ড করা ওদের যাবতীয় আলাপ? ছবি?' পোর্ট ফোলিওটা হাঁটুর ওপর রেখে খুললেন জেনারেল বরিসভ। বের করলেন বড় বড় অনেকগুলো ছবি এবং একটা মিনি টেপ রেকর্ডার।

কিন্তু ওগুলো স্পর্শ করলেন না প্রফেসর। মনে হলো সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গেছেন। 'কেন, কেন লেগেছিলেন আপনি আমার ছেলের পিছনে?'

'পার্টি লাগিয়েছে, কমরেড প্রফেসর। ইচ্ছে করে লাগিনি আমি।'

'মানে?'

'ব্যাপারটা হলো, আমাদের যেসব ডেলিগেশন অন্য দেশে যায়, তার প্রতিটি সদস্যের জন্য বুক করা হোটেল রুমে আগে থেকেই ক্যামেরা-টেপ রেকর্ডার প্ল্যান্ট করে রাখি আমরা। আই মীন, আমার ডিরেক্টরেট। সে এমনকি নিজেদের ব্লকের দেশ হলেও । এ সিস্টেম পার্টির করা, কমরেড, আমি করিনি। দুঃখিত, সন্তান আমারও আছে। আমি জানি মনের মধ্যে কেমন লাগছে আপনার। কিন্তু বোঝেনই তো, আমি হুকুমের চাকর। হুকুম মানাই আমার কাজ।' ছবিগুলো গোছাতে শুরু করলেন বরিসভ।

'কি করতে যাচ্ছেন আপনি ওগুলো নিয়ে?'

কাঁধ শ্রাগ করলেন জেনারেল। 'আমার করণীয় একটাই কাজ আছে, কমরেড। পার্টিকে রিপোর্ট করা। কালই কাজটা সেরে ফেলব ভাবছি। দেরি করে ফেলার জন্যে কৈফিয়ত দিতে না হয় আবার।'

গলার স্বর চড়ে গেল প্রফেসরের। 'জেনারেল, আপনি আইন জানেন।

এসব সেন্ট্রাল কমিটি জেনে গেলে কি হবে গ্রোমিকোর তাও বোঝেন।'

'বুঝি। দশ বছরের ক্লোজ কনফাইনমেন্ট। উরাল, সাইবেরিয়া অথবা ব্ল্যাক সী'র কাছাকাছি কোথাও। কোন রেমিশন নেই। কিন্তু তাতে কি? আপনি অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের সম্মানিত সদস্য। আপনার ছেলের ব্যাপারটা ওরা নিশ্চই বিবেচনা করবে।'

'না না, প্লীজ। বিকল্প রাস্তা বলুন।'

শালা! কর্ এখন টেলিফোন, বানচোত্! সাইক্লোনের বেগে গাল পাড়তে লাগলেন বরিসভ। ডাক তোর বাবাকে। ডেকে বল ব্ল্যাকমেইলিঙের কথা।

'প্লীজ, কমরেড জেনারেল! আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি। কিন্তু দয়া করে ও কাজটি করবেন না। আমার ছেলে সিআইএকে তথ্য দিয়েছে, আর সে অপরাধে তার সাজা হয়েছে, জানাজানি হলে গলায় দড়ি দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না আমার, জেনারেল।' ভাব দেখে মনে হলো এখুনি কেঁদে উঠবেন প্রফেসর ভেউ ভেউ করে। বরিসভের পায়ে আছড়ে পড়াও বিচিত্র নয়।

'বেশ। ঠিক আছে।'

'প্রশ্ন করুন, কি জানতে চান প্ল্যান অরোরা সম্পর্কে?'

'অরোরা? তা সে যাই হোক। পুরোটা শুনতে চাই আমি। একদম শুরু থেকে শুরু করুন।'

আরম্ভ করলেন প্রফেসর জোসেফ পাভলভ। নিচু গলায় প্ল্যান অরোরার পুরো পরিকল্পনা খুলে বলতে লাগলেন তিনি। মাঝে মধ্যে বেশ কয়েকবার থামতে হলো তাঁকে বরিসভের নানান প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে।

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেলেন ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিস বরিসভ। প্ল্যানটির ভয়ঙ্করত্ব অনুধাবন করতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ন্যাটো

জোটভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনাহীন, প্রায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন এক সময় অরোরার মত প্ল্যান যারা করেছে, এবং যে তা অনুমোদন করেছে, তারা প্রত্যেকে একেকটা বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যারা বিনা যুদ্ধে, বিনা উস্কানিতে হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষ হত্যা করার পরিকল্পনা করতে পারে, তাদের আর কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায় ভেবে পেলেন না তিনি।

নো ফোর-মিনিট ওয়ার্নিঙ? ভাবছেন তিনি, নো রাডার ডিটেকশন অভ অ্যান ইনকামিং মিজাইল, নো চান্স ফর কাউন্টার স্ট্রাইক, নো আইডেন্টিফিকেশন অভ প্রিপারেটর? জাস্ট আ মেগাটন নিউক্লিয়ার বম্ব এক্সপ্লোশন ইন আ পুশ ট্রলি?

বারো

'সো, মেজর মাসুদ রানা,' বললেন জেনারেল ডিয়েটার গেরহার্ড। নিজ অফিস রুমে ভিজিটরস্ টেবিলে মুখোমুখি বসে আছেন তিনি আর রানা। 'আমাদের ডিপ্লোম্যাট ডি অ্যাঙ্গাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন নিশ্চই?'

'হ্যাঁ, জেনারেল।'

'কি প্রমাণ হলো, গিলটি?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'অ্যাজ হেল।'

স্থির হয়ে থাকলেন জেনারেল। ডান চোখের নিচের একটা রগ তিরতির করে লাফাচ্ছে। 'আমার সার্ভিসের নাম ভাঙিয়ে কার হয়ে কাজ করে সে, জানার অধিকার আছে আমার। না কি বলেন, মেজর?'

'অবশ্যই, স্যার। তবে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে আমার।'

'বেশ তো, বলুন।'

'এখনই অ্যাঙ্গাসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে যাবেন না আপনি দয়া করে। ওর দ্বারা ন্যাটোর যে ক্ষতি হয়েছে, তার খানিকটা হলেও পুষিয়ে নিতে চাই আমি। এজন্যে সময় দরকার।'

'কি করে পূরণ করবেন ক্ষতি, ডিজইনফর্মেশন?'

'জ্বি।'

'কত সময় লাগতে পারে?'

'একটু বেশিই লেগে যাবে হয়তো। কিন্তু আপনি জানেন তাড়াহুড়ো করে এ কাজ করা যায় না। তাতে কোন লাভ হবে না। ধরুন, মাস তিনেক।'

'এর মধ্যে বিএসএস ওকে পাকড়াও করবে না গ্যারান্টি দিতে পারেন?'

'পারব। এবং স্যার লংফেলোও দেবেন। কাল লণ্ডন পৌঁছেই সে ব্যবস্থা করব আমি।'

'বেশ। সে ক্ষেত্রে আপনার অনুরোধ রক্ষা না করার কোন কারণ দেখি না।'

'ধন্যবাদ জেনারেল।'

'এবার বলুন, কোথায় ভুল করেছে অ্যাঙ্গাস! কখন পক্ষ বদল করেছে?'

'এর কোনটিই করেনি সে, জেনারেল। কোন ভুল করেনি. পক্ষ বদলও করেনি। আপনি ওর অটোবায়োগ্রাফি পড়েছেন?'

'নিশ্চই। এবং লংফেলোর টেলিফোন পাওয়ার পর যতদূর সম্ভব ওর সত্যতা যাচাইও করেছি। কিন্তু কোথাও কোন গরমিল পাইনি।'

'পাননি, কারণ ওর সাথে সত্যের কোন অমিল আসলেই নেই। অ্যাঙ্গাসের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণে বর্ণে সত্যি, জেনারেল, দাঁড়ি কমাসহ।'

হতভম্ব দেখাল জেনারেল গেরহার্ডকে। 'তার মানে সব সত্যি?'

'সব সত্যি, অন্তত অ্যাঙ্গাস এবং তার সহযোদ্ধা সাইলেসিয়া প্লেইনে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়া পর্যন্ত। পরেরটুকু ডাহা মিথ্যে। সর্বৈব মিথ্যে।'

বিস্ময় আরও বেড়ে গেল এনআইএস চীফের। কিন্তু প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলেন।

'প্রথমে আপনাকে জানতে হবে, ডি অ্যাঙ্গাসের সঙ্গে অন্য আরেকজন যে ছিল, তার ইতিহাস। ফ্রিক্কি বা ফ্রেডরিখ ব্রান্ট নাম ছিল তার। হিটলার জার্মানির ক্ষমতায় আসার দু'বছর পর, ১৯৩৫ সালে এক জার্মান রেলওয়ে কর্মচারী, নাম জো বা জোসেফ ব্রান্ট, বার্লিনের সাউথ আফ্রিকান লিগেশনে গিয়ে তাকে ইমিগ্রেশন ভিসা দেয়ার অনুরোধ জানায়, কমপ্যাশনেট গ্রাউণ্ডে। কারণ সে ইহুদি বলে তার এবং তার পরিবারের জানমালের নিরাপত্তা নাকি প্রচণ্ড হুমকির মুখে পড়েছে।

'ব্যাপারটা বিশ্বাস করে লিগেশন, এবং ভিসা দিয়ে দেয় জোসেফ ব্রান্টকে। সে তথ্য প্রমাণ আমার হাতে আছে। কাল আমি ইস্ট লণ্ডন থেকে টেলিফোন করার পর আপনার নির্দেশে ইউনিয়ন বিল্ডিং এ ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য টেলেক্স করে পাঠিয়েছিল আমাকে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কের মত মাথা দোলালেন জেনারেল গেরহার্ড। 'সে সময় অনেক ইহুদিকে ইমিগ্রেশন ভিসা দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রচুর ইহুদি এদেশে আসে তখন। অবশ্য কেবল ওরাই নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এসেছিল।'

'ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেমারহেভেন থেকে জাহাজে চড়ে

জোসেফ ব্রান্ট, স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান ফ্রিক্কিকে নিয়ে। ছয় সপ্তাহ পর ইস্ট লণ্ডন বন্দরে ভেড়ে জাহাজ। ওখানে অনেক জার্মান ছিল। তাদের মধ্যে দুই একটা পরিবার ছিল ইহুদি। ইস্ট লণ্ডনেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জোসেফ এবং ওখানকার মাশার্লিং ইয়ার্ডে চাকরি জুটিয়ে নেয়। অভিজ্ঞতা ছিল বলে এতে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাকে।

'একটা নতুন ইহুদি পরিবার এসেছে, কথাটা ছড়িয়ে গেল। একদিন স্থানীয় র‍্যাবি, ইহুদি ধর্মযাজক, জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে এল। জুইশ কমিউনিটিতে যোগ দিতে অনুরোধ করল তাকে। কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হলো সে। কষ্ট পেল র‍্যাবি মনে, ফিরে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। কিছু সন্দেহও করল না।

' '৩৮ সালে বালক ফ্রিক্কির বয়স হলো তেরো। ইহুদিদের এই বয়সে ধর্মমতে দীক্ষা নেয়ার সময়, যাকে 'বার-মিজবাহ্' বলে। যাদের একটিই সন্তান, তাদের জন্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ সময় আবার ওদের বাড়ি এল র‍্যাবি। জানতে চাইল ছেলেকে জোসেফ অফিশিয়েট করতে চায় কিনা। জবাবে র‍্যাবির গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসে লোকটা। ঘাড় ধরে বের করে দেয় তাকে বাসা থেকে। তখনই র‍্যাবির মনে জাগল সন্দেহ।'

'কি সন্দেহ?' জেনারেলকে হতবুদ্ধি মনে হলো।

'ওরা আদৌ ইহুদি নয়,' বলল মাসুদ রানা।

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। সৌভাগ্যের ব্যাপার, পঁচানব্বই বছর বয়স নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন সেই র‍্যাবি। র‍্যাবি শ্যাপিরো। কাল তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আমার। 'বার-মিজবাহ্'-এর মাধ্যমে র‍্যাবি ইহুদি সন্তানকে ধর্মমতে দীক্ষা দেয় এবং আশীর্বাদ করে। তবে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হয় তাকে যে ছেলেটির বাবা-মা সত্যিই ইহুদি। এটা জানতে হয় তাকে ছেলের মার কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে নয়। এবং মাকে এ সময়

'কেতুবাহ্' নামে এক ডকুমেন্ট দেখাতে হয় র‍্যাবিকে, যা প্রমাণ করে সে ইহুদি। এই 'কেতুবাহ্' দেখতে চেয়েছিল বলেই চড় খেতে হয়েছিল শ্যাপিরোকে।'

'তার মানে মিথ্যে ইহুদি সেজে এদেশে ঢোকে ওরা?'

'নিঃসন্দেহে।'

'তারপর?'

'পরের ঘটনাগুলো আমার অনুমান, প্রমাণ করতে পারব না। তবে বিচার করে দেখলে অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যাবে। জোসেফ ব্রান্ট আপনাদের পশ্চিম জার্মান লিগেশনকে এক অর্থে সত্যি কথাই বলেছে। গেস্টাপোরা তার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা ইহুদি হওয়ার অপরাধে নয়, সে একজন মিলিটান্ট, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অ্যাকটিভিস্ট, সেই অপরাধে। সে কথা বললে ভিসা পেত না জোসেফ ব্রান্ট।'

'গো অন।'

'আঠারো বছর বয়সে ফ্রিক্‌কি ব্রান্ট কমিউনিস্ট পিতার আদর্শের দীক্ষায় পরিপূর্ণ দীক্ষিত হয়ে ওঠে। খুব সম্ভব এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কমিনটার্নের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে সে। ১৯৪৩ সালে দুই তরুণ আফ্রিকানার যুদ্ধে যায়। একজন, ডুয়েলস্‌ক্লুফের ডি অ্যাঙ্গাস, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বিট্রিশ কমনওয়েলথের পক্ষে। অন্যজন, ইস্ট লণ্ডনের ফ্রেডরিখ ব্রান্ট, তার ইডিওলজিক্যাল মাদারল্যাণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে।

'স্বাভাবিকভাবে যেটা হতে পারত, বেসিক ট্রেনিঙের সময় দু'জনের পরিচয় হওয়া, অ্যাঙ্গাস বা ব্রান্টের মধ্যে ব্যাপারটা সেভাবে ঘটেনি। ঘটেছে তারা দুজন যখন একই ট্রাকে চড়ে সাইলেসিয়ার জঙ্গল অতিক্রম করছিল, তখন। অ্যাঙ্গাসের অটোবায়োগ্রাফিতেও এর স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। ইফ ইউ রিকল, প্রথমেই সে দ্বিতীয়জনকে আরেক অপরিচিত আফ্রিকানার বলে উল্লেখ করেছে।

'ব্রান্ট অ্যাঙ্গাসকে পালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। করে এই জন্যে যে তার মাথায় একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ছিল।

'জঙ্গলে কয়েকদিন কাটায় ওরা। এই সুযোগে অ্যাঙ্গাসের সঙ্গে আন্তরিকতা জন্মায় ব্রান্টের। গল্পে গল্পে তার ছোটবেলাকার এটা-ওটা খুঁটিনাটি আত্মস্থ করে নেয় সে। এরপর রুশবাহিনীর হাতে স্বেচ্ছায় অ্যাঙ্গাসকে নিয়ে ধরা দেয় ব্রান্ট। যে করেই হোক, ওদেরকে নিজ পরিকল্পনার কথা বোঝাতে সক্ষম হয় সে, এবং খুশি হয়ে দুজনকেই এনকেভিডির হাতে সমর্পণ করে রুশ বাহিনী।

'এবার মূল কাজে হাত দেয় এনকেভিডি। নির্যাতন করে ডি অ্যাঙ্গাসের পুরো ঠিকুজি-কুষ্ঠি বের করে নেয় তার পেট থেকে। যা পুরো মুখস্থ করে ফেলে ব্রান্ট। এর পর তার চেহারা পরিবর্তন করে রুশরা প্লাস্টিক সার্জারি করে, প্রায় অবিকল ডি অ্যাঙ্গাসে পরিণত করে ব্রান্টকে। এমনিতেই দু'জনের আকার-গঠন, এমনকি চুলের রঙ পর্যন্ত একই রকম ছিল। কাজেই অসুবিধের কিছু ছিল না। তার ডগ ট্যাগ পরিয়ে দেয় এর গলায়। মোটামুটি যখন নিশ্চিত হলো রুশরা যে ব্রান্টকে এখন অনায়াসে অ্যাঙ্গাস বলে চালানো যাবে, তখনই হত্যা করা হয় আসল অ্যাঙ্গাসকে। এরমধ্যে শেষ হয়ে যায় যুদ্ধ।

'এরপর নকল অ্যাঙ্গাসের কাহিনী সবাইকে বিশ্বাস করানোর জন্যে নকল অ্যাঙ্গাসের ওপর খানিকটা আর্টিফিশিয়াল টর্চারের ব্যবস্থা করে ওরা। কিছু কেমিক্যাল প্রয়োগ করে সত্যি সত্যি অসুস্থ করে তোলা হয় ওকে এবং পটস্ড্যামে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়। বেলিফিল্ড আর গ্ল্যাসগো হাসপাতালে কয়েক মাস চিকিৎসাধীন থেকে '৪৫ এর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হয় নকল অ্যাঙ্গাস। তার জাহাজ কেপ টাউন পৌঁছায় '৪৬ এর জানুয়ারিতে।

'কিন্তু এখানে বড় একটা সমস্যা ছিল আসল অ্যাঙ্গাসের বাবা, ভ্যান অ্যাঙ্গাস। তাঁর সামনে পড়লেই জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়

ছিল। 'আকার-গঠন-চেহারা যতই এক হোক, যতই প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়ে থাকুক, আপন সন্তানকে বাপ চিনতে পারবেন না, এ অসম্ভব। তাই কমিনটার্নের পুরানো বন্ধুদের সাহায্য কামনা করে ব্রান্ট। আবার অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করে ওয়েনবার্গ মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি হয়।

'বন্ধুরা ভ্যান অ্যাঙ্গাসকে কেব্‌ল্‌ করে জানায় সে কথা। এবং দেরি না করে তাকে কেপ টাউন চলে আসার অনুরোধ জানায়। কার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করা হয় জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, হয়তো ডিফেন্স হেডকোয়ার্টারের, অথবা হতে পারে আর কোন কল্পিত নাম দিয়ে। ওটা কোন বড় ব্যাপার ছিল না দীর্ঘদিন একমাত্র পুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল পিতার কাছে, বড় ছিল বার্তাটা।

'বার্তা পেয়েই কেপ টাউনের পথে রওনা হয়ে যান ভ্যান অ্যাঙ্গাস। এবং পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের বাইরে, মূটসেকি ভ্যালি হাইওয়েতে তাঁকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। গাড়ির ফুটো হয়ে যাওয়া চাকা পথের ওপর বদল করছিলেন বৃদ্ধ, এই সময় দ্রুতগামী এক ট্রাক পিষে দিয়ে যায় তাঁকে। হিট-অ্যাণ্ড-রান অ্যাক্সিডেন্ট। পরেরটুকু সোজা। ছেলে 'অসুস্থ', তাই পিতার শেষকৃত্যে যোগ দেয়ার জন্যে যেতে পারেনি। ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের কেউই সন্দেহ করেনি কিছু। এরপর ওখানকার ভ্যান অ্যাঙ্গাসের লইয়ারকে ডি অ্যাঙ্গাসের তরফ থেকে তার নামে পিতার উইল করে রেখে যাওয়া যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। সেইমত কাজ করেন ভদ্রলোক, বিক্রয়লব্ধ টাকা পাঠিয়ে দেন ওয়েনবার্গ হাসপাতালের ঠিকানায়।'

থামল মাসুদ রানা। নীরবতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল। উইণ্ডো পেনে একটা মাছির মৃদু 'পোঁ পোঁ' ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই সাউণ্ড প্রুফ অফিস রুমে। থেমে থেমে মাথা দোলাতে লাগলেন জেনারেল। আনমনে উদাস চোখে চেয়ে আছেন জানালা দিয়ে বাইরে। অনেক দূরে,

একসার পাহাড়ের মাথায় পড়ন্ত বিকেলের রোদের খেলা দেখছেন।

'ইট মেকস্ সেন্স, মেজর,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন ডিরেক্টার গেরহার্ড। 'আমারও মনে হয় আপনার প্রতিটি অনুমানই মোটামুটি সঠিক। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এসব অনুমান। প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মাসুদ রানা। 'ঠিক বলেছেন, জেনারেল।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন তিনি। 'মেজর, এমন কিছু কি আছে, যাতে আপনার ধারণা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে সাহায্য করবে?'

কোটের ভেতরের পকেটে হাত চালিয়ে একটা ছবি বের করল ও, এগিয়ে দিল জেনারেলের দিকে। 'ছবিটা আসল ডি অ্যাঙ্গাসের সর্বশেষ তোলা ছবি, স্যার, '৪৩ সালের। তার পারিবারিক অ্যালবাম থেকে সংগ্রহ করা। ক্যাপশন পড়লে বোঝা যায় মোটামুটি ভালই ক্রিকেট খেলত। বোলার ছিল সে। বল ছোঁড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে নেয়া হয়েছে ছবিটা। লক্ষ করলে দেখবেন, অ্যাঙ্গাসের বল ধরার কায়দাটা একজন স্পিনারের এবং বাঁ হাতে বল করছে সে।'

'সো?'

'এদেশে আসার আগে পুরো চারদিন ডি অ্যাঙ্গাসের ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রেখেছি আমি, স্যার। গাড়ি চালানো, ধূমপান, খাওয়া সব কাজ ডান হাতে করে সে। চেষ্টা করলে একজন মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবকিছুই বদলে দিতে পারবেন আপনি আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে। কিন্তু একজন বাঁ-হাতিকে ডান হাতিতে পরিণত করতে পারবেন না কোনদিনই।'

নীরব হয়ে গেলেন এনআইএস চীফ। ছবিটার ওপর ঘন ঘন স্থান বদল করছে দৃষ্টি। ভাবনার মেঘ ক্রমেই ঘন হয়ে চেপে বসছে চেহারায়।

'কমিউনিস্ট?'

ডেডিকেটেড কমিউনিস্ট জেনারেল। যে সাড়ে চার দশকেরও বেশি

সময় ধরে আছে সাউথ আফ্রিকান ফরেন সার্ভিসে। অথচ কাজ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে।'

আবার পাহাড়গুলোর দিকে তাকালেন গেরহার্ড। ডুবে গেছে সূর্য। রেশ খানিকটা এখনও আছে। 'আই উইল টিয়ার দ্যাট বাস্টার্ড অ্যাপার্ট।'

'আমাকে এবার বিদেয় নিতে হয়, জেনারেল। ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে ফ্লাইটের। আপনার সহযোগিতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ,' আসন ছেড়ে হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল মাসুদ রানা।

ডিয়েটার গেরহার্ডও উঠলেন। 'সব ধন্যবাদ সব অভিনন্দন কেবল আপনার প্রাপ্য, মেজর। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার এই তৎপরতার কথা আজীবন স্মরণ থাকবে আমার। দেখুন চেষ্টা করে, তিন মাসের মধ্যে ন্যাটোর ক্ষতি কতটা পুষিয়ে নেয়া যায়। ঠিক নব্বই দিন পর ধরব আমি ওকে।'

'অল রাইট, জেনারেল, স্যার। গুড বাই।'

'গুড বাই, মেজর। রাহাতকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন।'

রাত ন'টা। জান স্মুটস্-এর ডিপারচার লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে রানা এবং ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজের লণ্ডন ফ্লাইট প্রস্তুত। যাত্রীদের বিমানে উঠে আসন গ্রহণের শেষ আহ্বান জানাচ্ছে মহিলা অ্যানাউন্সার। টারমাকে বেরিয়ে এল ওরা, পাশাপাশি এগোচ্ছে গ্যাঙওয়ের দিকে।

'আপনাকে একটা উপাধি দিতে চাই, মেজর।'

'কি?'

'জ্যাগহণ্ড,' ঠোঁট টিপে হাসল পিয়েনার।

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন,' মৃদু নড করল মাসুদ রানা। যেন মাথা পেতে গ্রহণ করল উপাধিটা। 'কথাটার অর্থ?'

'কেপ হান্টিং ডগ। ধীরস্থির কিন্তু অনমনীয়। নাছোড়বান্দা।'

পরিবেশ ভুলে হো হো করে হেসে উঠল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' বলল ক্যাপ্টেন।

'অবশ্যই।'

'সেদিন ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কবরে ফুল দিয়েছিলেন কেন?'

মুখ ঘুরিয়ে অপেক্ষমাণ এয়ার লাইনারের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। আনমনা হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে। অজস্র কেবিন লাইটের উজ্জ্বল আভায় ঝলমল করছে দৈত্যাকার ডিসি টেন থার্টি। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ও। 'যখন বুঝলাম ওরা তার একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, পুত্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে একাকীত্বের যন্ত্রণায় কাতর এক বৃদ্ধ পিতাকে নিজেদের পাপ ঢাকা দিতে গিয়ে কাপুরুষের মত নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তখন হতভাগ্য বিদেহী মানুষটির প্রতি সহানুভূতি জানানোর আর কোন সহজ উপায় খুঁজে পাইনি, তাই দিয়েছিলাম ফুল।'

দশ মিনিট পর রানওয়ে ত্যাগ করল বিমান। নাক উঁচু করে খাড়া তর্জনির মত আরোহণ করল অসীম শূন্যে। তারপর উত্তরে বাঁক নিয়ে ভেসে চলল ইউরোপের দিকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে মাসুদ রানা। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল প্রিটোরিয়া।

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২৩-৭-৯৪ মৃত্যুর ছায়া (প্রজাপতি) রকিব হাসান

বিষয়ঃ গভীর হলো রাত। নিঝুম নীরবতা চারদিকে। ঠিক এই সময় অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে শুরু করল।

২৩-৭-৯৪ সন্ধ্যার মেঘমালা (রোমান্টিক) খন্দকার মজহারুল করিম

বিষয়ঃ অঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে নীতার প্রথম সাক্ষাৎ সুখকর নয়। লোকটি অসম্ভব কর্তৃত্বপরায়ণ ও রূঢ়। তারপরও নীতা একদিন উপলব্ধি করল, ওই লোক ছাড়া তার জীবন অর্থহীন।

আরও আসছে

২৫-৭-৯৪ কুয়াশা (৪৩, ৪৪, ৪৫) ভলিউম ১৫ টা. ২৫/- কাজী আনোয়ার হোসেন

২৮-৭-৯৪ রহস্যপত্রিকা টা. ১৫/- (১০ বর্ষ ১০ সংখ্যা, আগস্ট '৯৪)

৪-৮-৯৪ ঝামেলা (তিন গোয়েন্দা) রকিব হাসান

৪-৮-৯৪ অশুভ পিরামিড (প্রজাপতি)) কাজী শাহনূর হোসেন